كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থঃ "তোমরাই হইলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হইয়াছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে।" (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১১০)

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَـةً

অর্থঃ "একটি বাণী হলেও আমার নিকট থেকে (মানুষকে) পৌঁছে দাও।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

মূল

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

শিক্ষক মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

অনুবাদকের আরজ

আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ মুসলমানদের একটি অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য। হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন উপায়ে এই আদেশ ও নিষেধের উপর আমল করিতেছেন। তাছাড়া দাওয়াত ও তাবলীগের নামে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে উহার উপর আমল হইতেছে।

সাধারণভাবে মনে করা হয়– মানুষকে সত্য, কল্যাণ ও দ্বীনের পথে আহবান করার নামই "সৎ কাজের আদেশ" এবং পাপ, অকল্যাণ ও গোমরাহীর পথ হইতে বিরত থাকিতে বলার নামই "অসৎ কাজের নিষেধ"। অথচ ইসলামের এই মৌলিক ও গুরুত্ব পূর্ণ আমলটির আরো কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে কিনা এবং এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা আছে কিনা, এই বিষয়ে আমাদের সকলেরই ধারণা অত্যন্ত সীমিত। সর্বকালের সেরা মুসলিম দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ) "আমরে বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার" শীর্ষক কিতাবে এইসব বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

"সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর উপর আমল করার যোগ্য ব্যক্তিকে এই কাজের ক্ষেত্রে কি কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া আবশ্যক, এই কাজের ক্ষেত্র ও সীমা কতটুকু, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই কাজ ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ– ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের প্রামাণিক জবাবসম্বলিত এই কিতাবটি ইমাম গাযযালীর এক অমূল্য অবদান। এই বিষয়ের উপর কোরআন-হাদীসের দলীলসহ এমন যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক কিতাব ইমাম গাযযালীর আগে বা পরে অপর কেহ রচনা করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সুতরাং কোন প্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বলা চলে– সংশ্লিষ্ট প্রঙ্গের উপর ইহাই সর্বকালের সেরা কিতাব। ইতিপূর্বে ভারতের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা নামীদ আল ওয়াজেদী মূল শীরোনামে এই কিতাবটির উর্দু তরজমা করেন। আমরা উর্দু হইতে বাংলায় তরজমা করিয়া কিতাবটির নাম দিয়াছি "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ"।

এমন একটি মূল্যবান কিতাবের বঙ্গানুবাদ বাংলাদেশী পাঠকদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আমরা আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর আদায় করিতেছি। আল্লাহ পাক আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন এবং কিতাবটিকে আমার জন্য আমার মাতাপিতা, পীর-উস্তাদ ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের উসিলা করিয়া দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত–
মোহাম্মদ খালেদ
শিক্ষক, মাদীনাতুল উলূম মাদরাসা
কামরাঙ্গীর চর, আশরাফাবাদ
ঢাকা–১৩১০

তারিখ
১লা সেপ্টেম্বর ২০০১ ইং
কুমিল্লাপাড়া, কামরাঙ্গীর চর
আশরাফাবাদ, ঢাকা- ১৩১০

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

পূর্বাভাষ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামের একটি অন্যতম আমল। এই আমলের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যই পৃথিবীতে আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামগণের আগমন ঘটিয়াছিল। তাঁহারা আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিধান মানুষের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে নবীগণের আগমনের ধারা বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর এই দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামের উপর অর্পিত হইয়াছে। মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের প্রশ্নে এই আমলের আবশ্যকতা কতটা গুরুত্ববহ এই প্রসঙ্গে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট হইতে পারে যে, মানুষ যদি অবহেলা বশে এই আমল পরিত্যাগ করে, তবে দুনিয়াতে নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যহত হইয়া দ্বীনের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে চরম অবক্ষয় ও গোমরাহী ছড়াইয়া পড়িবে। দ্বীনের এই আহাম ও গুরুত্বপূর্ণ আমলের অনুপস্থিতির কারণে মানুষ ক্রমে আল্লাহর বিধান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাপাচার-অনাচার ও ফেৎনা-ফাসাদের কঠিন তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে এবং এক পর্যায়ে মানুষের অপরাধ অনুভূতি লোপ পাইয়া এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হইবে যে, মানুষ আল্লাহ পাকের অসংখ্য নাফরমানী করিবার পরও উহাকে কোন অপরাধই মনে করিবে না।

বর্তমান সময়ে সম্ভবতঃ আমাদের সেই আশংকাই বাস্তবে প্রমাণিত হইতেছে। দ্বীনের এই বুনিয়াদী আমল সম্পর্কে মানুষের ধারণা ক্রমেই লোপ পাইতেছে এবং কালক্রমে মানুষ ইহার আমল একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছে। মানুষ এখন সৃষ্টিকর্তা খালেকের বন্দেগী ত্যাগ করিয়া মানুষেরই গোলামী করিতে শুরু করিয়াছে। দ্বীনের ছহী সমঝ ও আমল হইতে দূরে সরিয়া পড়ার কারণেই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এখন চতুষ্পদ জন্তুর নিকৃষ্টতাকেও হার মানাইতেছে। ভূ-পৃষ্ঠে এমন সত্যিকার ঈমানদার নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে,

যাহারা সব রকম বাঁধা-বিপত্তি ও প্রতিকুলতা উপেক্ষা করিয়া আল্লাহ পাকের বিধানের উপর কায়েম থাকিতে সচেষ্ট হইবে। এহেন নাজুক সময়ে যাহারা সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে দ্বীনের হাল ধরিয়া মানুষের মাঝে আবারো নবীওয়ালা আমল জারীর মেহনতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিবে, তাহারা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে মহান পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিবে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মেহনত তথা আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের আমলটি অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যবহ। আমরা এই বিষয়টিকে চারিটি পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করার প্রয়াস পাইব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব ও ফজিলত

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

অর্থঃ "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যাহারা আহ্বান জানাইবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করিবে অন্যায় কাজ হইতে, আর তাহারাই হইল সফলকাম। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১০৪)

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা "সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ" এর উপর আমল করা মানুষের জন্য আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আয়াতের বিবরণে আরো যেই কয়টি বিষয় প্রমাণিত হয় তাহা হইল, মানুষের কামিয়াবী ও সাফল্যকে বিশেষভাবে এই আমলের সহিত যুক্ত করিয়া বলা হইয়াছে, أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (তাহারাই হইল সফলকাম)। দ্বিতীয়তঃ এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর আমলটি ফরজে কেফায়া; ফরজে আইন নহে। মুসলমানদের একটি জামায়াত যদি এই আমল করে তবে অবশিষ্টগণ এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। কেননা, আয়াতে এইরূপ বলা হয় নাই যে, তোমরা সকলেই এই কাজ করিতে হইবে। বরং বলা হইয়াছে, তোমাদের মধ্য হইতে একদল মানুষের এই দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। অবশ্য এই কথা বলা হইয়াছে যে, সফলতা বিশেষভাবে সেইসব ব্যক্তিদেরই প্রাপ্য যাহারা এই দায়িত্ব পালন করিবে। কিন্তু সমাজের কেহই যদি এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে সকলকেই শাস্তি ভোগ

করিতে হইবে; বিশেষতঃ যাহাদের এই কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অবহেলা করিবে, তাহারা অবশ্যই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

অন্য আয়াতে আছে–

لَيْسُوْا سَوَاءً ط مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ * يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ ط وَأُولٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ *

অর্থ ঃ "তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যাহারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তাহারা সেজদা করে। আর আল্লাহর প্রতি ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ হইতে বারণ করে এবং সৎ কাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকে। আর ইহারাই হইল সৎকর্মশীল।" (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১১৩ – ১১৪)

এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, কেবল আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস করাই নেক আমল নহে; বরং আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারকেও উহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

কালামে পাকের অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ *

অর্থঃ "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তাহারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ হইতে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে।" (সূরা তওবাঃ আয়াত ৭১)

উপরোক্ত আয়াতে ইমানদারদের কতক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ইহাও আছে যে, তাহারা সৎ কাজের আদেশ করে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, যাহাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান নহে, তাহারা মোমেনদের সেই দলের মধ্যে গণ্য হইবে না– যাহাদের কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্য আয়াতে আছে–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ * كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ *

অর্থঃ "বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কাফের তাহাদিগকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধ্যতা করিত এবং সীমা লংঘন করিত। তাহারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করিত না, যাহা তাহারা করিত। তাহারা যাহা করিত তাহা অবশ্যই মন্দ ছিল।" (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ৮)

উপরোক্ত আয়াতে কঠোর ভাষায় বলা হইয়াছে যে, এমন লোকেরা অভিসপ্ত যাহারা সমাজে অন্যায়-অবিচার ছড়াইতে দেখিয়াও উহা দমন করার ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করিত না।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং এই কাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থঃ "তোমরাই হইলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হইয়াছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে।" (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১১০)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ *

অর্থঃ "অতঃপর যখন তাহারা সেই সব বিষয় ভুলিয়া গেল, যাহা তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছিল, তখন আমি সেইসব লোককে মুক্তি দান করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে বারণ করিত। আর পাকড়াও করিলাম গোনাহগারদিগকে নিকৃষ্ট আজাবের মাধ্যমে তাহাদের নাফরমানীর দরুন।" (সূরা আ'রাফঃ আয়াত ১৬৫)

যাহারা মানুষকে মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করে, তাহাদের নাজাত ও মুক্তির কথা উপরোক্ত আয়াতে বিবৃত হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা এই কাজের আবশ্যকতাও প্রমাণিত হয়।

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ *

অর্থঃ "তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান

করিলে তাহারা নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে।" (সূরা হজ্বঃ আয়াত ৪১)

বস্তুতঃ আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের ফজিলত ও গুরুত্ব প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলামের অন্যতম রোকন নামাজ ও রোজার পাশাপাশি এই আমলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ص وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ص

অর্থঃ "সৎ কর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করিও না।" (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ২)

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত সহযোগিতার অর্থ হইতেছে উৎসাহ যোগানো। অর্থাৎ যাহারা জানে তাহাদের কর্তব্য হইতেছে– যাহারা জানে না তাহাদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা এবং এই পথের পথিকদিগকে সহযোগিতা করা। আর অন্যায়-অবিচারের কাজে সহযোগিতা না করার অর্থ হইতেছে– এমন সব পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া যাহা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ *

অর্থঃ "দরবেশ ও আলেমরা কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে এবং হারাম ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে না? তাহারা খুবই মন্দ কাজ করে।" (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ৬৩)

এই আয়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধ চিহ্নিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিত না।

আল্লাহ পাক বলেন–

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْ بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ

অর্থঃ "কাজেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রহিল না, যাহারা পৃথিবীতে বিপর্য সৃষ্টি করিতে বাধা দিত।" (সূরা হুদঃ ১১৬)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى

اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ *

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাহাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।" (সূরা নিসাঃ আয়াত ১৩৫)

সুতরাং পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গের জন্য ইহাই হইতেছে সৎ কাজের আদেশ।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا *

অর্থঃ "তাহাদের অধিকাংশ সলা পরামর্শ ভাল নহে; কিন্তু যেই সলাপরামর্শ দান খয়রাত করিতে কিংবা সৎ কাজ করিতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করিত তাহা স্বতন্ত্র। যে এই কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তাহাকে বিরাট ছাওয়াব দান করিব। (সূরা নিসাঃ আয়াত ১১৪)

অন্যত্র বলা হইয়াছে–

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا *

অর্থঃ "যদি মোমেনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে।" (সূরা হুজরাতঃ আয়াত ৯)

মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের অর্থ হইল, তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ হইতে বাধা দিয়া আনুগত্যের পথে ফিরাইয়া আনা। কিন্তু তাহারা যদি হক ও ন্যায়ের পথে রুজু করিতে অস্বীকার করিয়া নিজেদের অবাধ্যতার উপরই জমিয়া থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়া বলা হইয়াছে–

فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ *

অর্থঃ "তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে; যেই পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে।" (সূরা হুজরাতঃ আয়াত ৯)

আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস

একদা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) খোৎবা প্রদানকালে ফরমাইলেন, হে লোকসকল! তোমরা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ কর এবং উহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাক। আয়াতটি এই–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ *

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রহিয়াছ তখন কেহ পথভ্রান্ত হইলে তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।" (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ১০৫)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

ما بين قوم عملوا بالمعاصي و فيهم من يقدر ان ينكر عليهم فلم يفعل الا يوشك ان يعمهم بعذاب من عنده ·

অর্থঃ "যেই কওম গোনাহ করে এবং তাহাদের মধ্যে গোনাহ হইতে নিষেধ করিতে সক্ষম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি সে নিষেধ না করে, তবে ইহা অসম্ভব নহে যে, আল্লাহ পাক তাহাদের সকলের উপর আজাব নাজিল করিবেন।" (সুনানে আরবা')

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই আয়াতে যেই যুগের কথা বলা হইয়াছে তাহা এখনো আসে নাই। কেননা, এখনো নসীহত করিলে মানুষ তাহা শোনে এবং পালনও করে। কিন্তু খুব শীঘ্রই এমন একটি সময় আসিবে যখন সৎ কাজের আদেশদাতাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে। তুমি কোন (ভাল) কথা বলিলে তাহা কেহই মানিবে না। তুমি যদি সেই যুগটি প্রাপ্ত হও, তবে এই আয়াতের উপর আমল করিবে এবং শুধু নিজেরই চিন্তা করিবে।

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لتأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ·

অর্থঃ "তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাদের উপর দুষ্ট লোকদিগকে চাপাইয়া দিবেন। তখন তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি দোয়া করিলেও তাহা কবুল করা হইবে না।" অর্থাৎ সাধারণ লোকদের অন্তরে বিশিষ্ট লোকদের কোন মর্যাদা থাকিবে না এবং তাহাদিগকে ভয় করিবে না। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

يا ايها الناس ان الله يقول لتأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر قبل ان

تدعوا فلا يستجاب لكم ·

অর্থঃ "হে লোকসকল! আল্লাহ পাক বলিতেছেন, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর, সেই দিন আসিবার পূর্বে, যখন তোমরা দোয়া করিবে আর তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে না।"

এক হাদীসে আছে–

ما اعمال البر عن الجهاد في سبيل الله الا كنفشة في بحر لجي و ما جميع اعمال البر و الجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الا كنفشة في بحر لجي ·

অর্থঃ "আল্লাহর পথে জেহাদ করার বিপরীতে সমস্ত নেক আমলের উপমা যেন গভীর সমুদ্রে একটি মাত্র ফুঁক। অনুরূপভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর বিপরীতে আল্লাহর পথে জেহাদ এবং সমস্ত নেক আমলের উপমা যেন গভীর সমুদ্রে একটি মাত্র ফুঁক।"

অন্য হাদীসে আছে–

ان الله تعالى يسأل العبد ما منعك اذ رايت المنكر فاذا لقن الله العبد حجته قال رب ! وثقت بك و فرقت من الناس ·

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন, মন্দ কাজে বারণ করা হইতে তোমাকে কিসে বিরত রাখিল? তখন যদি আল্লাহ তাঁহার বান্দাকে জবাব শিখাইয়া দেন, তবে সে আরজ করিবে, পরওয়ারদিগার! আমি তোমার উপর ভরসা করিয়াছিলাম এবং মানুষকে ভয় করিয়াছিলাম। (ইবনে মাজা)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ তোমরা পথে উপবেশন করা হইতে বাঁচিয়া থাক। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের জন্য দুষ্কর। কেননা, পথ হইল আমাদের মজলিস। আমরা তথায় উপবেশন করিয়া পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি। এরশাদ হইলঃ তোমরা যদি পথের উপর বসিতেই চাও, তবে অবশ্যই পথের হক আদায় করিবে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, পথের হক কি? তিনি এরশাদ করিলেনঃ দৃষ্টি নত রাখা, কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া, ছালামের জবাব দেওয়া এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। (বোখারী, মুসলিম)

এক হাদীসে আছে–

كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امرا بمعروف و نهيا عن منكر او ذكر الله تعالى

অর্থঃ "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর জিকির ব্যতীত মানুষের সব কথাই ক্ষতিকর হইয়া থাকে– উপকারী হয় না।"

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছেঃ আল্লাহ পাক সাধারণ লোকদের গোনাহের কারণে বিশিষ্ট লোকদিগকে শাস্তি দেন না। কিন্তু সাধারণ লোকেরা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি বিশিষ্ট লোকেরা বাধা না দেয়, তবে এই বিশিষ্ট লোকদের উপর আজাব নাজিল করা হয়। (আহমাদ)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

روي ابو امامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : كيف انتم طغى نساءكم و فسق شبائكم و تركتم جهادكم، قالوا : واذ لك كائن يا رسول الله ! قال نعم ! و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون، قالوا : و ما اشد منه يا رسول الله ؟ قال : كيف انتم اذا لم تأمروا بمعروف و لم تنهوا عن منكر، قالوا : و كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم : و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون ، قالوا و ما اشد منه ؟ قال : كيف انتم اذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا، قالوا : و كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم، و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون قالوا و ما اشد منه ، قال : كيف انتم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف، قالوا : و كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون، يقول الله تعالى بي حلفت لا يتحن لهم فتنة بصير الحليم فيها خيرانا ·

অর্থঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে যখন তোমাদের স্ত্রীগণ অবাধ্যতা করিবে, যুবকরা কুকর্ম শুরু করিবে এবং তোমরা জেহাদ ছাড়িয়া দিবে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! প্রকৃতপক্ষেই এমন অবস্থা হইবে কি? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ হাঁ! যেই আল্লাহর আয়ত্বে আমার প্রাণ, তাঁহার কসম, এতদ্অপেক্ষাও গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদ্অপেক্ষা গুরুতর অবস্থা কি হইতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যখন তোমরা সৎ কাজের আদেশ করিবে না এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিবে না? জিজ্ঞাসা করা হইল, এমন অবস্থাও কি হইবে? জবাবে তিনি ফরমাইলেনঃ

হাঁ! সেই জাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, ইহার চাইতেও মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইহার চাইতেও মারাত্মক অবস্থা কি হইতে পারে? তিনি বলিলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যখন তোমরা ভাল কাজকে মন্দ এবং মন্দ কাজকে ভাল মনে করিবে? ছাহাবীগণ জানিতে চাহিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! এমনও হইবে কি? জবাবে তিনি ফরমাইলেনঃ যেই আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ, ইহার চাইতেও কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইহার চাইতেও কঠিন অবস্থা কি হইতে পারে? তিনি ফরমাইলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যখন তোমরা মন্দ কাজের আদেশ করিবে এবং ভাল কাজ করিতে নিষেধ করিবে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! এমন অবস্থাও হইবে কি? এরশাদ হইলঃ ইহার চাইতেও কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। সেই জাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি আমার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহাদিগকে এমন ফেৎনায় নিপতিত করিব যে, তাহাদের বুদ্ধিমান লোকেরা সেই ফেৎনায় হতভম্ভ হইয়া যাইবে।

হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তোমরা তাহার নিকট দাঁড়াইও না। কেননা, যেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং উহার প্রতিবাদ না করে তাহার উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। (অনুরূপভাবে) যাহাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হয়, তাহার নিকটও দাঁড়াইও না। কেননা, যেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিয়া জুলুমের প্রতিরোধ করে না, তাহার উপরও অভিশাপ বর্ষিত হয়।

(তাবরানী, বায়হাকী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه حق · لا تكلم به فانه لن يقدم اجله و لن يحرمه رزقا هو له ·

অর্থঃ যেই ব্যক্তি এমন কোন স্থানে উপস্থিত থাকে যেখানে সত্য কথা বলা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে সে যেন উহা হইতে বিরত না থাকে। কেননা, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আসিবে না এবং যেই রিজিক তাহার ভাগ্যে আছে উহা হইতেও সে বঞ্চিত হইবে না। (বায়হাকী)

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে ইহা জানা গেল যে, জালেম ও ফাসেকগণের

ঘরে যাওয়া জায়েজ নহে এবং এমন স্থানেও যাওয়া উচিত নহে, যেখানে প্রকাশ্যে মন্দ কাজ চলিতেছে অথচ তাহার পক্ষে উহা বন্ধ করা, বাধা দেওয়া কিংবা ঘৃণা প্রকাশ করারও ক্ষমতা নাই। কেননা, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে এমন ব্যক্তিদের উপর অভিশাপ বর্ষণের কথা উল্লেখ আছে, যাহারা জুলুমের স্থানে উপস্থিত থাকে এবং উহা প্রতিরোধ না করে। উহার প্রতিরোধে তাহার অক্ষমতা থাকিলেও সে এই অভিশাপের শিকার হইবে। এই কারণেই আমাদের কোন কোন পূর্ববর্তী বুজুর্গ লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেননা, তাহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, এমন কোন লোকসমাগম নাই যেখানে অন্যায়-অপরাধ হইতেছে না আর তাহাদের পক্ষে উহা প্রতিরোধ করারও কোন ক্ষমতা ছিল না। এমতাবস্থায় লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনবাসই উত্তম।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেন, আজ আমরা যেই পরিস্থিতির শিকার, এই অবস্থার কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ নিজেদের বাড়ী-ঘর ও সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজন অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেননা, তাহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, সমাজ হইতে সৎ কর্ম অন্তর্হিত হইয়া অনাচার ও পাপাচারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং মানুষকে সদুপদেশ প্রদান ও নসীহতের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমনকি কেহ সাহস করিয়া নসীহত করিলেও তাহাকে নানারূপ নির্যাতনের শিকার হইতে হইতেছে। এমতাবস্থায় তাহারা আশংকা করিয়াছেন, এই পাপাচারের অঙ্গনে অবস্থানের ফলে ফেৎনায় জড়াইয়া তাহারাও আল্লাহর আজাবের শিকারে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং তাহারা এহেন দুষ্ট লোকদের সঙ্গে বসবাস করার পরিবর্তে বনে-জঙ্গলে লতাপাতা খাইয়া হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে বসবাস করাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই বক্তব্য প্রদানের পর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন–

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ *

অর্থঃ "অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁহার তরফ হইতে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা জারিয়াতঃ আয়াত ৫০)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেন, কতক লোক নিজেদের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাওয়ার পর তাহাদের সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর ঘটনা শোনা গিয়াছে। নবুওয়্যতের মধ্যে যদি কোন ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিত, তবে আমরা ইহাই বলিতাম যে, নবীগণ তাহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ফেরেশতাগণ তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত ও মোসাফাহা করেন। আকাশের বাদল ও বনের হিংস্র প্রাণী তাহাদের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সম্মুখে আসিয়া থামিয়া যায়। তাহারা ডাক দিলে সাড়া দেয়

এবং আজ কোথায় যাওয়ার হুকুম হইয়াছে, কোন্ ভূখণ্ডে বর্ষণ হইবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক ঠিক জবাব দেয়। অথচ তাহারা নবী ছিলেন না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

من حضر معصية كفرها فكأنه غاب عنها و من غاب عنها فاحبها فكأنه حضرها ٠

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি কোন গোনাহের স্থানে উপস্থিত থাকে এবং উহাকে খারাপ মনে করে, তবে সে যেন সেখানে উপস্থিত ছিল না। আর যেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত না হইয়াও ঐ গোনাহকে ভাল মনে করে, তবে সেই ব্যক্তি এমন যেন সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে।" (ইবনে আদী)

উপরোক্ত হাদীসের মর্ম হইতেছে– কোন ব্যক্তি যদি আবশ্যকীয় কোন প্রয়োজনে কোন গোনাহের স্থানে যায় কিংবা সে যখন গিয়াছে তখন সেখানে কোন গোনাহের অনুষ্ঠান ছিল না বটে, কিন্তু পরে ঘটনাক্রমে তাহা শুরু হইয়াছে, এই উভয় অবস্থায় তাহার কর্তব্য হইতেছে– নিজের হাত, জবান কিংবা অন্তর দ্বারা সেই গোনাহের প্রতি নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করা। আর ইচ্ছাকৃতভাবে গোনাহের জায়গায় যাওয়া নিষেধ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যত নবী প্রেরণ করিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহাদের সহচরও ছিল। নবীগণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপন সহচরদের মাঝে অবস্থান করিয়া আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার বিধানের উপর আমল করেন। অবশেষে আল্লাহ পাক যখন তাঁহার নবীকে উঠাইয়া লন, তখন নবীর সহচরগণ আল্লাহর কিতাব, তাঁহার হুকুম ও স্বীয় নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করিতে থাকেন। নবীর এই সহচরগণ বিদায় হওয়ার পর এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহারা মিম্বরে বসিয়া এমন কথা বলিবে যাহা তাহারা জানে, আর (বাস্তব ক্ষেত্রে) তাহারা এমন আমল করিবে যাহা তাহারা জানে না। এই সম্প্রদায়টি দৃষ্টিগোচর হইলে তাহাদের সঙ্গে হাত দ্বারা জেহাদ করা ওয়াজিব হইবে। হাত দ্বারা সম্ভব না হইলে অন্তর দ্বারা জেহাদ করিবে। উহার পর ইসলামের কোন স্তর নাই।

একটি বস্তির ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একটি বস্তির ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, সেই বস্তির লোকেরা ব্যাপকভাবে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল।

তাহাদের মধ্যে কেবল চারজন এমন আবেদ ছিলেন যাহারা মানুষের এইসব পাপাচারকে ঘৃণা করিতেন। তাহারা এমন কামনা করিতেন যেন বস্তির লোকেরা আল্লাহর নাফরমানী ত্যাগ করিয়া সৎ পথে ফিরিয়া আসে। পরে তাহাদের একজন দ্বীন ও ঈমানের দাওয়াত লইয়া বস্তির লোকদের মাঝে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলকে দ্বীনের পথে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ভাইসকল! তোমরা পাপাচার ও নাফরমানীর পথ পরিহার করিয়া আল্লাহ পাকের গোলামী ও শান্তির পথে ফিরিয়া আস। কিন্তু বস্তির পাপী লোকদের নিকট তাহার এই আহ্বান কোন ক্রিয়া করিল না এবং তাহারা সরাসরি এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিল। পরে তিনি কঠোর ভাষায় তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন কাজ হইল না। বরং জবাবে তাহারাও এই ব্যক্তির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিল। অবশেষে তিনি বস্তির লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সংখ্যায় তাহারা অধিক ছিল বিধায় তাহাদেরই জয় হইল। অবশেষে তিনি মর্মাহত হৃদয়ে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে নিবেদন করিলেন, আয় মাওলায়ে কারীম! আমি তাহাদিগকে পাপের পথে চলিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা শোনে নাই। আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে জবাবে তাহারাও আমাকে তিরস্কার করিয়াছে। পরে আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলাম। কিন্তু লোকবল ও জনবলের আধিক্যের কারণে যুদ্ধে তাহারাই জয়ী হইয়াছে। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথে আমি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর দ্বিতীয় আবেদ বস্তিতে গিয়া দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা পাপের পথ পরিহার করিয়া ন্যায়-সত্য ও শান্তির পথে ফিরিয়া আস। কিন্তু বস্তির লোকেরা তাহার কথা মানিতে সরাসরি অস্বীকার করিল। তিনি তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় ভীতি প্রদর্শন করিলে জবাবে তাহারাও কঠোর ভাষা ব্যবহার করিল। অবশেষে তিনি ব্যর্থ হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, আয় পারওয়ারদিগার! আমি তাহাদিগকে দ্বীনের পথে আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। আমি তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হয় নাই। আমি যদি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতাম তবে (জনবল ও সংখ্যাধিক্যের কারণে) তাহারাই আমার উপর জয়ী হইত। এই কারণে (আর সামনে অগ্রসর না হইয়া) আমি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর তৃতীয় আবেদ নিজের পূর্ববর্তীদের অনুসরণে দ্বীনের দাওয়াত লইয়া সেই বস্তিতে গেলেন। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে বস্তিবাসীগণ! তোমরা যেই পথে চলিতেছ তাহা পাপের পথ। এই পথে চলিলে

তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর গোলামী ও শান্তির পথে ফিরিয়া আস। কিন্তু লোকেরা তাহার এই দাওয়াতে কোনরূপ কর্ণপাত করিল না। অতঃপর তিনিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহর দরবারে অনুযোগ করিলেন।

অবশেষে চতুর্থ ব্যক্তি সেই বস্তিবাসীদের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কয়েক কদম অগ্রসর হওয়ার পরই তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করিয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, পরওয়ারদিগার! আমি যদি তাহাদিগকে দ্বীনের পথে আহ্বান করিতাম, তবে তাহারা আমার কথা শুনিত না। আমি তাহাদিগকে মন্দ বলিলে তাহারাও আমাকে মন্দ বলিত। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে আমিই পরাজিত হইতাম। এই কারণে আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।

উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বর্ণিত চার ব্যক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির মরতবা সর্বাধিক। আর তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির মর্যাদা সব চাইতে কম। কেননা, সে কেবল দাওয়াত দেওয়ার এরাদা করিয়াছিল, কিন্তু বস্তিবাসীদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত লইয়া যাওয়ার হিম্মত করিতে পারে নাই। কিন্তু তোমাদের মাঝে এই শেষোক্ত ব্যক্তির মত লোকও খুব কম হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, আয় আল্লাহর রাসূল! যেই বস্তিতে আল্লাহর নেক বান্দাগণ বিদ্যমান, উহাও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে কি? তিনি বলিলেনঃ হাঁ, (সেই বস্তিও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে)। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, নেক বান্দাগণ আলস্যবশে আল্লাহর নাফরমানী দেখিয়াও নীরব থাকার কারণে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

اوحى الله تبارك و تعالى الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كذا و كذا على اهلها فقال : يا رب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال : اقلبها عليه و عليهم فان وجهه لم يتغير في ساعة قط ·

অর্থঃ একদা আল্লাহ পাক এক ফেরেশতাকে আদেশ করিলেন, অমুক জনপদটি উহার অধিবাসীসহ উল্টাইয়া দাও। ফেরেশতা আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! সেই জনপদে আপনার এমন এক নেক বান্দা আছে, যিনি

মুহূর্তের জন্যও আপনার কোন নাফরমানী করে নাই। আল্লাহ পাক বলিলেনঃ তাহাকে এবং সকল অধিবাসীসহই জনপদটি উল্টাইয়া দাও। কেননা, অধিবাসীদের নাফরমানী দেখিয়া মুহূর্তের জন্যও তাহার চেহারা বিমর্ষ হয় নাই।

(তাবরানী, বায়হাকী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

عذب اهل قرية فيها ثما نية عشر الفا عملهم عمل الانبياء قالوا : يا رسول الله ! كيف ؟ قال : لم يكونوا يغضبون الله و لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر ·

অর্থঃ একবার এমন এক বস্তির অধিবাসীদেরকে আজাব দেওয়ার আদেশ হইল, যাহাদের মধ্যে আঠার হাজার ব্যক্তি এমন ছিল, যাহাদের আমল ছিল পয়গম্বরগণের আমলের মত। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, (এত অধিক সংখ্যক আবেদ থাকার পরও) কি কারণে তাহাদের উপর আজাব হইল? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ তাহারা আল্লাহর (নাফরমানী দেখার) কারণে ক্রুদ্ধ হয় নাই এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিত না।

হযরত উরওয়া স্বীয় পিতা হইতে নকল করেন, একদা হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আপনার সব চাইতে প্রিয় বান্দা কে? এরশাদ হইল—

০ যেই ব্যক্তি আমার নির্দেশের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়, যেমন গাধা উহার শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

০ যেই ব্যক্তি আমার নেক বান্দাদের সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু তাহার মাতার বক্ষকে জড়াইয়া ধরে।

০ যেই ব্যক্তি আমার নিষিদ্ধ কাজে জড়িত ব্যক্তিদের উপর এমনভাবে ক্রুদ্ধ হয়, যেমন ব্যাঘ্র উহার প্রতিপক্ষের উপর ক্রুদ্ধ হয়। ব্যাঘ্র যখন উহার প্রতিপক্ষের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্ধত হয়, তখন সে ইহা হিসাব করিয়া দেখে না যে, তাহার শত্রুপক্ষ সংখ্যায় কম না বেশী।

হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন জেহাদ আছে কি? জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেনঃ হাঁ! ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর পথে জেহাদকারীগণ বিদ্যমান। তাহারা জীবিত, রিজিকপ্রাপ্ত এবং দুনিয়াতে

তাহারা বিচরণ করে। আল্লাহ তায়ালা আকাশের ফেরেশতাদের সঙ্গে তাহাদের বিষয়ে গর্ব করেন। তাহাদের জন্য জান্নাত সজ্জিত করা হয়। এইবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ হে আবু বকর! সেই সকল লোক হইল, যাহারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে এবং আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে মোহাব্বত করে ও শত্রুতা পোষণ করে।

অতঃপর তিনি আরো এরশাদ করিলেন, সেই মহান জাতের কসম যাহার আয়ত্বে আমার প্রাণ, তাহারা শহীদগণের কক্ষের উপরে অবস্থান করিবে। প্রতিটি কক্ষের তিন লক্ষ দরজা হইবে। কতক দরজা হইবে ইয়াকুত ও সবুজ পাল্লা নির্মিত। প্রতিটি দরজাতেই নূর থাকিবে। তাহাদের একজনের সঙ্গে তিন লক্ষ ডাগর নয়না হুরের বিবাহ হইবে। কোন হুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে তাহাকে অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া বলিবে– তোমার কি মনে পড়ে, অমুক দিন তুমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়াছিলে? এইভাবে সে তাহার নেক আমলসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

হযরত ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বলেন, একবার আমি পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, আয় আল্লাহর রাসূল আল্লাহ পাকের নিকট সব চাইতে উত্তম শহীদ কে? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, যেই বক্তি কোন জালেম শাসনকর্তার সামনে দাঁড়াইয়া সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে আর এই কারণে সেই জালেম শাসক তাহাকে হত্যা করে। জালেম শাসক যদি তাহাকে হত্যা না করে তবে সে যত দিন জীবিত থাকিবে তাহার নামে কোন অপরাধ লেখা হইবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

افضل شهداء امتي رجل قام الي امام جائر فامر بالمعروف و نها عن المنكر فقتله على ذالك فذالك الشهيد منزلته في الجنة بين حمزة و جعفر .

অর্থঃ আমার উম্মতের সবচাইতে উত্তম শহীদ সেই ব্যক্তি, যে জালেম শাসনকর্তার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাকে সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে আর এই অপরাধের কারণে সে তাহাকে হত্যা করে। জান্নাতে এই শহীদের মর্যাদা হামজা ও জাফরের মধ্যস্থলে হইবে।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রসঙ্গে মহা মনীষীগণের উক্তি

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর দায়িত্ব পালন করিতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাদের উপর এমন জালেম শাসক চাপাইয়া দিবেন যে তোমাদের বড়দেরকে সম্মান করিবে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে না। তোমাদের পরহেজগার লোকেরা জালেম শাসকের জন্য বদদোয়া করিবে কিন্তু সেই বদদোয়া কবুল হইবে না। তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে কিন্তু তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে কিন্তু তোমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে না।

একবার হযরত হোজাইফাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ব্যক্তি জীবিত হইয়াও মৃতদের মধ্যে গণ্য? জবাবে তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন মন্দ কাজ হইতে দেখিয়া তাহা হাত দ্বারা প্রতিহত করে না। কিংবা মুখে উহাকে খারাপ বলে না বা অন্তরেও ঘৃণা করে না।

হযরত মালেক ইবনে আহবার বলেন, বনী ইসরাঈলের এক আলেমের খেদমতে সর্বদা নারী-পুরুষের ভীড় লাগিয়া থাকিত। আর তিনি সমবেত লোকদিগকে দ্বীনের কথা শোনাইতেন এবং অতীতের জাতিসমূহের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করিয়া উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিতেন। এক দিন সেই আলেম দেখিতে পাইলেন, তাহার ছেলে উপস্থিত এক নারীর দিকে তাকাইয়া আছে এবং তাহাকে চোখে ইশারা করিতেছে। ছেলের এই আচরণটি ছিল অত্যন্ত গর্হিত। কিন্তু আলেম তাহার ছেলেকে কেবল বলিলেন, "এইরূপ করিও না" উহার অতিরিক্ত তাহাকে আর কিছুই বলিলেন না)। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলেম নিজের আসন হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ একই সময় তাহার স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহার ছেলে যুদ্ধে নিহত হইল।

এই সময় আল্লাহ পাক সেই যুগের পয়গম্বরের নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করিলেন যে, অমুক আলেমকে বলিয়া দিন, আমি তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যেও কোন নেককার পয়দা করিব না। কেননা, তাহার সকল কার্যক্রম যদি আমার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য হইত, তবে তাহার ছেলের সেই অন্যায় আচরণের জন্য কেবল এতটুকুই বলিত না যে, এইরূপ করিও না। বরং উহার জন্য তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত।

হযরত হোজাইফা (রাঃ) বলেন, এমন একটি সময় আসিবে যখন লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিদের

তুলনায় মৃত গাধাকে উত্তম মনে করিবে।

আল্লাহ পাক হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আমি আপনার কওমের চল্লিশ হাজার ভাল লোককে এবং ষাট হাজার মন্দ লোককে ধ্বংস করিয়া দিব। এই বাণী শুনিয়া হযরত ইউশা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, পরওয়ারদিগার! মন্দ লোকেরা ধ্বংস হইয়া যাওয়ার কারণ তো স্পষ্ট, কিন্তু ভাল লোকেরাও কি কারণে মন্দ লোকদের পরিণতি বরণ করিবে তাহা বোধগম্য নহে। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে জবাব আসিল– উহার কারণ এই যে, ভাল লোকেরা মন্দ লোকদের (পাপকর্ম) দেখিবার পরও তাহাদের) উপর অসন্তুষ্ট হইত না এবং (স্বাভাবিকভাবেই) তাহাদের সঙ্গে খানাপিনা (ও চলাফিরা) করিত। আমার সঙ্গে যদি ভাল লোকদের সামান্য সম্পর্কও থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা মন্দ লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিত।

হযরত বিলাল ইবনে সা'দ বলেন, কোন ব্যক্তি যখন গোপনে নাফরমানী করে, তখন উহা দ্বারা কেবল সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই নাফরমানী যখন প্রকাশ্যে করা হয় আর উহাতে কেহ বাধা না দেয়, তখন উহা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যাহারা এই নাফরমানী দেখিয়া নীরবতা অবলম্বন করে, তাহারাও উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একদা হযরত কা'বুল আহবার আবু মুসলিম খাওলানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কওমে আপনার অবস্থান কেমন? তিনি বলিলেন, আমার কওম আমাকে অত্যন্ত সম্মান করে। হযরত কা'ব বলিলেন, তাওরাত কিতাবে কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন রকম মন্তব্য লিখিত আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাওরাতে কি লিখিত আছে? হযরত কা'ব বলিলেন, উহাতে লিখিত আছে, যেই ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর আমলে নিযুক্ত থাকিবে কওমের মধ্যে তাহার কোন মর্যাদা থাকিবে না এবং লোকেরা তাহাকে ভাল নজরে দেখিবে না। বরং তাহার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হইবে। এইবার হযরত আবু মুসলিম খাওলানী বলিলেন, তাওরাত কিতাবে সত্য লিখিত আছে এবং আবু মুসলিম মিথ্যাবাদী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) দাওয়াত ও নসীহতের উদ্দেশ্যে হুকুমতের আমলাদের নিকট তাশরীফ লইয়া যাইতেন। কিছু দিন পর হঠাৎ তিনি এই কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিলেন। লোকেরা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার এই আমলের কারণে লোকেরা হয়ত মনে করিবে, আমার কথা ও কাজে বৈপরীত্য বিদ্যমান। আর আমি যদি তাহাদিগকে কিছুই না বলি, তবে আমি "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" বর্জনকারী

বলিয়া সাব্যস্ত হইব এবং উহার ফলে আমি গোনাহগার হইব।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, যেই ব্যক্তি "আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার" করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে এমন স্থানে অবস্থান করা ঠিক নহে; যেখানে উহার উপর আমল করা আবশ্যক হয়।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) বলেন, তোমাদের নিকট প্রথম যেই জেহাদের কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে তাহা হইল হাতের জেহাদ। অতঃপর মুখের জেহাদ এবং সব শেষে অন্তরের জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। মানুষের অন্তর যদি ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ মনে না করে, তবে তাহাকে উপুড় করিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে সত্যের আলো ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে কঠিন অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়।

হযরত সহল ইবনে তশতরী (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি অপরকে কিছু বলার ক্ষমতা রাখে না, সে যদি নিজের ব্যক্তিজীবনে আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ পাবন্দির সহিত পালন করে এবং অপরকে পাপকর্ম করিতে দেখিয়া অন্তর দ্বারা উহাকে ঘৃণা করে, তবে মনে করা হইবে– সে যেন অপরাপর মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করিল।

হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন না কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, অনেকে এই কাজ করিতে গিয়া কাফের হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর উপর আমল করার কারণে তাহাদের উপর যেই নির্যাতন করা হইয়াছে, উহাতে তাহারা ধৈর্য ধারণ করিতে পারে নাই।

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরীকে এই একই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, সমুদ্র যখন উহার রোখ পরিবর্তন করিয়া ধাবিত হয়, তখন উহার বিপরীতে দাঁড়াইয়া উহার গতি রোধ করা কাহারো পক্ষেই সম্ভব হয় না।

উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, মুসলমানদের পক্ষে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব। শক্তি ও ক্ষমতা থাকা অবস্থায় এই দায়িত্ব এড়াইবার কোন উপায় নাই। তবে এই আমল সম্পাদন করিতে যাহার শক্তি ও ক্ষমতা নাই; এই ক্ষেত্রে তাহাকে অবশ্যই অক্ষম মনে করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদেশ ও নিষেধের শর্ত

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গোটা আমলটি মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত–

১. মুহ্‌তাসিব (আদেশ ও নিষেধকারী)।
২. মুহ্‌তাসিব আলাইহি (যাহাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়)।
৩. মুহ্‌তাসিব ফীহি (যেই বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয়)।
৪. ইহ্‌তিসাব (স্বয়ং আদেশ ও নিষেধ)।

প্রথম শর্তঃ মুকাল্লাফ হওয়া

মুহতাসিব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর প্রথম শর্ত হইল "মুকাল্লাফ" বা শরীয়তের বিধিবিধান পালনে যোগ্য হওয়া। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধসম্পন্ন হওয়া। কেননা, "গায়রে মুকাল্লাফ" তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধহীন ব্যক্তির পক্ষে শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী নহে। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, এই পর্যায়ে যেই শর্তের কথা বলা হইতেছে, তাহা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত– কেবল জায়েজ হওয়ার নহে। অর্থাৎ একজন বোধসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উপর আমল করা জরুরী। এই কারণেই এই কাজের জন্য বোধসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কেননা, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই এই কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। তো এই কাজের জন্য বালেগ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া জরুরী নহে। সুতরাং যেই বালক ভাল মন্দের জ্ঞান রাখে সে মুকাল্লাফ না হইলেও তাহার পক্ষে অসৎ কাজের নিষেধ করা জায়েজ। যেমন শরাবের পাত্র মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া বা খেলাধুলার সামগ্রী ভাঙ্গিয়া ফেলা ইত্যাদি। এইরূপ করিলে সে ছাওয়াবের পাত্র হইবে এবং এই কাজে তাহাকে বাধা দেওয়া জায়েজ হইবে না। অর্থাৎ তাহাকে এইরূপ বলিয়া বারণ করা যাইবে না যে, "তুমি তো এখনো মুকাল্লাফ নও, সুতরাং কি কারণে তুমি অসৎ কাজের নিষেধ করিতেছ?" কারণ এই যোগ্যতা তাহার মধ্যে ঈমানের কারণে হাসিল হইয়াছে– প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সুবাদে নহে। সুতরাং তাহার পক্ষে বড়দের মতই কোন কাফেরকে হত্যা করা এবং তাহার অস্ত্র ও মালামাল ছিনাইয়া লওয়া জায়েজ। তবে শর্ত হইল এই কাজে যেন কোনরূপ প্রতিকুল অবস্থার শিকার হওয়ার আশংকা না থাকে।

দ্বিতীয় শর্তঃ মোমেন হওয়া

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য মোমেন হওয়ার শর্তটি স্পষ্ট। কেননা, দ্বীনের মদদ-নুসরত এবং দ্বীনকে সমুন্নত রাখার অপর নামই হইতেছে "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ"। সুতরাং যেই ব্যক্তি মোমেন নহে এবং দ্বীনকে অস্বীকার করে, তাহার পক্ষে এই কাজের যোগ্য হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

তৃতীয় শর্তঃ আদেল হওয়া

কাহারো কাহারো মতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য 'আদেল' (কবীরা গোনাহ হইতে মুক্ত) হওয়া শর্ত। তাহারা মনে করেন, একজন ফাসেক ও পাপাচারীর পক্ষে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার অধিকার নাই। কেননা, যেই ব্যক্তি নিজে আল্লাহর নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত; সে কেমন করিয়া অপরকে সৎ কাজের নসীহত করিবে?

প্রথম দলীল

উপরোক্ত প্রসঙ্গে প্রথম দলীল হিসাবে তাহারা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করিয়াছেন–

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ *

অর্থঃ "তোমরা কি মানুষকে সৎ কর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাও।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ৪৪)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ *

অর্থঃ "তোমরা যাহা কর না, তাহা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক।" (সূরা ছফঃ আয়াত ৩)

দ্বিতীয় দলীল

দ্বিতীয় দলীল হিসাবে তাহারা নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন–

مررت ليل اسرى بي بقوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من انتم. فقالوا كنا نأمر بالخير و لا نأتيه و تنهى عن الشر و نأتيه .

অর্থঃ "মেরাজের রাতে আমি এমন কতক লোকের নিকট দিয়া গিয়াছি, যাহাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হইতেছিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পরিচয় কি? জবাবে তাহারা বলিল, আমরা সৎ

কাজের আদেশ করিতাম কিন্তু নিজেরা তাহা করিতাম না। অপরকে মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিতাম কিন্তু নিজেরা উহাতে লিপ্ত থাকিতাম।"

তৃতীয় দলীল

একদা আল্লাহ পাক হযতর ঈসা (আঃ)-এর উপর এই মর্মে ওহী নাজিল করিলেন যে, হে ঈসা! আপনি প্রথমে নিজের নফসকে নসীহত করুন। আপনার নফস যখন সেই নসীহত মানিয়া উহার উপর আমল শুরু করিবে, তখন অপরকে নসীহত করুন। অন্যথায় আমাকে লজ্জা করুন।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে যাহারা "আদেল" হওয়া অবশ্যক মনে করেন, তাহাদের মতে সাধারণ কেয়াস ও মানবীয় বিচার-বুদ্ধিও এই কথাই বলে যে, এই ক্ষেত্রে 'আদেল' শর্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মূল কথা হইল– অপরকে সৎ পথ দেখানো। সুতরাং অপরকে সৎ পথ প্রদর্শন করিতে হইলে আগে নিজে সৎ পথে চালিত হইতে হইবে।

'আদেল' এর শর্ত আবশ্যক নহে

উপরে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে 'আদেল' শর্ত হওয়া সংক্রান্ত এক শ্রেণীর লোকের ধারণার উপর আলোচনা করা হইল। কিন্তু আমরা এই ধারণার পরিপন্থী। আমাদের বিশ্বাস হইল, ফাসেক ও গোনাহগার ব্যক্তিও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে পারিবে। কেননা, যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, আদেশ ও নিষেধকারী ব্যক্তি যাবতীয় কবীরা গোনাহ হইতে পাক হইতে হইবে, তবে উহার অর্থ হইবে, আদেশ ও নিষেধের পথ একবারেই রুদ্ধ করিয়া দেওয়া। কারণ, এইরূপ নিষ্পাপ লোকও পাওয়া যাইবে না এবং আদেশ-নিষেধের কাজও আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হইবে না। কেননা, ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগের পুণ্যাত্মা ছাহাবায়ে কেরামের যুগেও এইরূপ নিষ্পাপ লোক পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পরবর্তী যুগে আদেশ-নিষেধের জন্য এইরূপ নিষ্পাপ মানুষ পাওয়া তো একেবারেই অসম্ভব। এই কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের জন্য যদি 'আদেল' হওয়া শর্ত লাগানো হয়, তবে এই বিষয়ের উপর আমল করা কাহারো পক্ষেই সম্ভব হইবে না। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) হযরত সাঈদের এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইল, ফাসেক ও গোনাহগারদিগকে আদেশ ও নিষেধ হইতে বিরত রাখার পক্ষপাতীগণ যেই আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন, উহাতে কি কথা ও কাজের বৈপরীত্যের নিন্দা করা হইয়াছে? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, বর্ণিত আয়াতে কথা ও কাজের বৈপরীত্যের নিন্দা

করা হয় নাই। বরং আলোচ্য আয়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এমন বোকামীপূর্ণ আচরণের নিন্দা করা হইয়াছে যে, তাহারা নিজেরা যেই সৎ কাজের উপর আমল করে না, অপরকে সেই কাজের আদেশ করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে নিজেদের এলেম থাকার কথা প্রকাশ করিতেছে। অথচ বাস্তব অবস্থা হইল, যেই ব্যক্তি আলেম, সে সৎ কাজ বর্জন করিলে তাহার শাস্তি অধিক হয়। কেননা, এলেম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি আমল করা না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার নিকট কোন সঙ্গত ওজর থাকে না। মোটকথা, বর্ণিত আয়াতে ভাল কাজ বর্জন করার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। আদেশ করার নিন্দা করা হয় নাই।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *

অর্থঃ "তোমরা যাহা কর না, তাহা কেন বল"? আসলে এই আয়াতে এমন লোকদের নিন্দা করা হইয়াছে যাহারা ওয়াদা খেলাফী করে। অনুরূপভাবে وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাও) আয়াতে এমন লোকদের নিন্দা করা হইয়াছে যাহারা গাফলতের মধ্যে লিপ্ত হইয়া নিজেদের এছলাহের ফিকির করে না। অর্থাৎ এখানে এই কারণে তাহাদের নিন্দা করা হয় নাই যে, তাহারা অপরাপর মানুষের এছলাহ ও আত্মসংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতেছে। এতদ সত্ত্বেও অপর লোকদের প্রসঙ্গ এই কারণে উত্থাপন করা হইয়াছে যেন এই কথা প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের মধ্যে সৎ কাজ ও অসৎ কাজের এলেম আছে এবং এই এলেম থাকা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের ব্যাপারে অবহেলা করিতেছে। এইরূপ অবহেলার শাস্তি কঠিন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহ পাকের এরশাদ "প্রথমে নিজেকে উপদেশ দিন" দ্বারা মৌখিক আদেশ ও নিষেধের কথা বলা হইয়াছে। এই কথা আমরাও স্বীকার করি যে, একজন পাপী লোকের মৌখিক উপদেশ এমন লোকদের জন্য উপকারী হয় না, যাহারা তাহার পাপাচার সম্পর্কে অবগত। এই বিবরণের শেষে বলা হইয়াছে, "আমাকে লজ্জা করুন"। সুতরাং ইহা দ্বারা অপরকে উপদেশ দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় না। বরং ইহার অর্থ হইতেছে– অধিক জরুরী বিষয় (নিজের আত্মসংশোধন) ত্যাগ করিয়া কম জরুরী বিষয় (অপরের সংশোধন)-এর পিছনে মশগুল হইও না।

চতুর্থ শর্তঃ শাসন কর্তার অনুমতি

কাহারো কাহারো মতে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের জন্য শাসনকর্তার পক্ষ হইতে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। তাহাদের মতে প্রজা সাধারণের কাহারো পক্ষেই শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া এই কাজ করার

অধিকার নাই। কিন্তু আমাদের মতে এই শর্ত ঠিক নহে এবং ইহা অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের ফজিলত এবং মুসলমানদের উপর এই আমলটি ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা যেই সকল আয়াত ও রেওয়ায়েত উল্লেখ করিয়াছি, উহা দ্বারা জানা যায়, যেই ব্যক্তি কোন মুনকার বা অপরাধকর্ম দেখিয়া চুপ থাকিবে সে গোনাহগার হইবে। কেননা, কুকর্ম যেখানেই এবং যেই অবস্থায়ই দেখা হউক, উহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব।

ইহতিসাবের পাঁচটি স্তর

ইহ্তিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পাঁচটি স্তর রহিয়াছে। যথা–

(এক) তা'রীফ। অর্থাৎ মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করা।

(দুই) মানুষকে দরদ ও মোহাব্বতের সহিত নসীহত করা।

(তিন) তিরস্কারের ভাষায় নসীহত করা। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, মানুষের প্রতি গালাগাল বা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিবে। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হে নির্বোধ! তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? অর্থাৎ এই জাতীয় অন্য কোন শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(চার) মানুষকে জোরপূর্বক কোন কাজ হইতে বিরত রাখা। যেমন কাহারো যদি শক্তি থাকে তবে শরাবের পাত্র বা খেল-তামাশার সামগ্রী ভাঙ্গিয়া ফেলা, রেশমী কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলা কিংবা ছিনতাইকৃত মালামাল উদ্ধার করিয়া প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি।

(পাঁচ) ধমকানো বা মারধোর করিয়া তাহাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তোলা। এই পরিমাণ প্রহার করা যেন উহার ফলে সে যেই অপরাধে লিপ্ত ছিল তাহা ছাড়িয়া দেয়। যেমন কোন ব্যক্তি হয়ত মানুষের গীবত শেকায়েত করিতেছে বা কোন মানুষের নামে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিতেছে কিংবা কাহাকেও গালি দিতেছে। আর এই সব কর্ম তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার মুখ তো একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে না বটে, তবে কয়েক ঘা লাগাইয়া আপাততঃ তাহাকে নিরস্ত করা যাইতে পারে। অবশ্য এই পঞ্চম স্তরটি কিছুটা নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ বটে। কেননা, এই ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টি হইয়া উভয় পক্ষে খুনাখুনি হওয়ার উপক্রম হইতে পারে বিধায় এই ক্ষেত্রে শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক হইবে। এই প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

মোটকথা, উপরে বর্ণিত পাঁচটি স্তরের প্রথম চারিটিতে ইমাম ও শাসকের অনুমতি আবশ্যক নহে। অর্থাৎ মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন, দরদ ও মোহাব্বতের

ভাষায় নসীহত করা এবং কোন ফাসেক ও বদকারকে তাহার অপরাধের জন্য তিরস্কার করা কিংবা কোন আহাম্মক ও নির্বোধকে তাহার বোকামী নির্দেশ পূর্বক সুপথে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করা– ইত্যাদি প্রশ্নে শাসনকর্তার অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা, এইসব প্রসঙ্গ হইল হক কথার মধ্যে শামিল। আর হক কথার দাবী হইল তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে হইবে। হাদীসে পাকে তো জালেম শাসনকর্তার মুখের উপর সত্য কথা বলাকে সর্বোত্তম জেহাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং যেখানে খোদ শাসনকর্তার সম্মুখেই সত্য কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে অন্যদের বেলায় সত্য কথা বলিতে শাসনকর্তার অনুমতি লওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

সুতরাং আমাদের আকাবেরে দ্বীন ও পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ সর্বদা শাসকদের সম্মুখে অকপটে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে এই বিষয়টি এজমা ও সর্বসম্মতভাবেই প্রমাণিত যে, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শাসকদের অনুমতি আবশ্যক নহে।

কথিত আছে যে, একবার মারওয়ান ঈদের নামাজের পূর্বে খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, ঈদের খোৎবা তো নামাজের পরে পড়া হয়। মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটিকে শাসাইয়া দিল। সেই জামায়াতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি মারওয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রতিবাদী লোকটি সত্য মাসআলা প্রকাশ করিয়া নিজের কর্তব্য আদায় করিয়াছে। কেননা, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায় কর্ম করিতে দেখিলে তাহার কর্তব্য হইবে– উহাকে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা। যদি হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তবে মুখে উহার প্রতিবাদ করিবে। যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে মনে মনে উহাকে ঘৃণা করিবে। আর ইহা হইল ঈমানের দুর্বলতম স্তর। পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ এইভাবেই শাসক শ্রেণীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা তাহারা এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা সকলেই সমান।

অন্যায়ের প্রতিবাদে বুজুর্গানে দ্বীনের সাহসিকতার কয়েকটি ঘটনা

খলীফা মাহদী মসনদে সমাসীন হওয়ার পর একবার তিনি মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করার পর একদিন বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিতে আসিলেন। এই সময় তাহার লোকজন বাইতুল্লাহর আশপাশ হইতে সকলকে সরাইয়া মাতাফ (তাওয়াফের জায়গা) খালী করিয়া দিল। অতঃপর তিনি তাওয়াফ শুরু করিলেন। অদূরে উপবিষ্ট আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক

এই দৃশ্য দেখিয়া খলীফার সম্মুখে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহার চাদরের প্রান্ত সজোরে টানিয়া ধরিয়া বলিলেনঃ দেখ, তুমি কি করিতেছ? তোমাকে এই ঘরের অধিক হকদার কে বানাইয়াছে যে, এখানে আগত লোকদিগকে তুমি বাধা দিতেছ? অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

سَوَاءً نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَ الْبَادِ

অর্থঃ "এই গৃহে স্থানীয় ও বহিরাগত সকলে সমান।" (সূরা হজ্বঃ আয়াত ২৫)

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হইয়া খলীফা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং সহসা কিছুই বলিতে পরিলেন না। কেননা, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। কিন্তু পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক? হযরত আব্দুল্লাহ নির্ভিক ও ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ! আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক। খলীফা তাহার আচরণে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়াছিলেন। এইবার তাহার স্পষ্ট কথনে পূর্বাধিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রেফতার করতঃ বাগদাদে পাঠাইয়া দিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুকের উপরোক্ত আচরণটি খলীফার দৃষ্টিতে যারপর নাই শাস্তিরযোগ্য ছিল। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাহাকে এমন কোন শাস্তি দেওয়া মোনাসেব মনে করিলেন না, যাহাতে সাধারণ মানুষের নিকট তাহার কোনরূপ অবমাননা হয়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া তাহাকে ঘোড়ার আস্তাবলে বাঁধিয়া রাখার নির্দেশ দিলেন, যেন ঘোড়ার পদাঘাতে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করেন। অতঃপর এই উদ্দেশ্যে একটি অবাধ্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ঘোড়াকে তাহার নিকট বাঁধিয়া রাখা হইল। কিন্তু আল্লাহ পাক ঘোড়ার স্বভাব পরিবর্তন করিয়া উহাকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলেন। ফলে খলীফার এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় তিনি কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না। খলীফা এই ব্যবস্থায় ব্যর্থ হইয়া পরে তাহাকে একটি অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করিয়া উহার চাবি নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন। কিন্তু তিন দিন পর দেখা গেল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক কারাগারের অদূরে একটি বাগানে মুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া ফিরিয়া লতাপাতা খাইতেছেন। বাগানের মালিকের মাধ্যমে খলীফা এই সংবাদ পাইয়া যারপর নাই অবাক হইলেন। তিনি সন্ধান লইয়া ইহাও জানিতে পারিলেন যে, কয়েদখানাটি আগের মতই তালাবদ্ধ আছে এবং তথা হইতে বন্দী পালাইয়া যাওয়ার বাহ্যিক কোন আলামতও পাওয়া যাইতেছে না। আর কয়েদখানার সেই চাবিটিও তাহার নিকটই রক্ষিত আছে। পরে তিনি কয়েদীকে দরবারে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কয়েদখানা হইতে কে বাহির করিয়াছে? তিনি বলিলেন, যিনি আমাকে বন্দী করিয়াছেন। খলীফা

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কে বন্দী করিয়াছে? এইবারও তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন, যিনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন। খলীফার নিকট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুকের এইসব জবাব অত্যন্ত হেয়ালীপূর্ণ মনে হইল এবং তিনি বিচলিত হইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, হে ইবনে মারজূক! তোমার কি মৃত্যুর ভয় নাই? আমি তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। এইবার তিনি পূর্বাধিক অবিচল কণ্ঠে জবাব দিলেন, জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা যদি তোমার মর্জি অনুযায়ী হইত, তবে অবশ্যই তোমাকে ভয় করিতাম। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের কোনটিতেই তোমার কিছুমাত্র হাত নাই; সুতরাং এই বিষয়ে তোমাকে ভয় করিবারও কোন কারণ নাই।

উপরোক্ত ঘটনার পর খলীফা মাহদী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুককে বন্দী করিয়া রাখেন। অবশেষে খলীফার মৃত্যুর পর লোকেরা তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনে। হযরত ইবনে মারজুক বন্দী অবস্থায় মান্নত করিয়াছিলেন, আল্লাহ পাক যদি তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দান করেন, তবে তিনি একশত উট কোরবানী করিবেন। মুক্তি লাভের পর মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই মান্নত পূরণ করেন।

এক বুজুর্গ কর্তৃক খলীফার বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলার ঘটনা

হাব্বান ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার খলীফা হারুনুর রশীদ তাহার খাদেম বনী হাশেমের সোলাইমান ইবনে আবু জাফরকে সঙ্গে লইয়া সফরে বাহির হইলেন। সফরের এক পর্যায়ে খলীফা খাদেমকে বলিলেন, তোমার নিকট তো একজন চমৎকার গায়িকা বাঁদী ছিল, তাহার গজল ও কণ্ঠস্বরের বেশ সুখ্যাতি শুনিয়াছি। তাহাকে আনার ব্যবস্থা কর, আমি তাহার গজল শুনিব। পরে বাঁদীকে আনার ব্যবস্থা করা হইল এবং যথা সময় সে গজল পরিবেশন করিল। কিন্তু খলীফার নিকট তাহার গজল মোটেও ভাল লাগিল না এবং তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাঁদীকে বলিলেন, আজ তোমার কি হইয়াছে, গজল জমিতেছে না কেন? ইতিপূর্বে তো তোমার কণ্ঠ বেশ ভাল ছিল। বাঁদী সবিনয়ে আরজ করিল, মহামান্য আমীরুল মোমেনীন! আজ যেই বাদ্যযন্ত্রটির মাধ্যমে আমি গজল পরিবেশন করিলাম, সেইটি আমার নহে। এই কারণেই আমি উহার সহিত তাল মিলাইয়া সুর তুলিতে পারিতেছি না। খলীফা সঙ্গে সঙ্গে খাদেমকে হুকুম দিলেন যেন এখুনি বাঁদীর বাদ্যযন্ত্রটি লইয়া আসা হয়। খাদেম ছুটিয়া গিয়া বাঁদীর বাড়ী হইতে তাহা লইয়া আসিতেছিল। পথে এক জায়গায় সে দেখিতে পাইল, এক বৃদ্ধ খেজুরের আঁটি কুড়াইতেছেন। খাদেমের পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইলেন, খাদেমের হাতে

একটি বাদ্যযন্ত্র। বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে খাদেমের হাত হইতে উহা ছিনাইয়া লইয়া মাটিতে আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় খাদেম একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। পরে সে মহল্লার হাকিমের নিকট গিয়া ঘটনার বিবরণ দিয়া বৃদ্ধকে বন্দী করিয়া রাখিতে বলিল। হাকীমকে সে এই কথাও জানাইয়া দিল যে, এই ব্যক্তি স্বয়ং খলীফার কাজে বাধা দিয়াছে। কিন্তু হাকীম বৃদ্ধকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন এবং তাঁহার বুজুর্গী সম্পর্কেও ওয়াকেফ ছিলেন। সুতরাং তিনি ইহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, তিনি এই মহান ব্যক্তিকে কেমন করিয়া বন্দী করিবেন। কিন্তু কথিত অপরাধটি যেহেতু স্বয়ং খলীফার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এই কারণে তিনি একান্ত বাধ্য হইয়াই তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

পরে খাদেম ফিরিয়া আসিয়া খলীফাকে ঘটনার বিবরণ শোনাইলে তিনি রাগে-ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় সোলাইমান বিন জাফর খলীফাকে বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন! আপনি উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নাই; আপনি বরং মহল্লার হাকীমকে নির্দেশ দিয়া পাঠান যেন বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাহার লাশ দজলা নদীতে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু খলীফা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি প্রথমে বৃদ্ধকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, সে কেমন করিয়া এমন দুঃসাহসিক কর্ম করিল।

পরে খলীফার সংবাদবাহক বৃদ্ধের নিকট গিয়া শাহী দরবারে হাজির হওয়ার ফরমান শোনাইলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অম্লান বদনে শাহী দূতের সঙ্গে রওনা হইলেন। দূত তাহাকে সওয়ারীতে আরোহণ করিতে বলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া পায়ে হাঁটিয়াই চলিলেন। শাহী মহলের বহির্ফটকে আসিয়া হাজির হওয়ার পর দূত ভিতরে গিয়া খলীফাকে সংবাদ দিল যে, আসামী হাজির হইয়াছে।

খলীফার কক্ষে তখন একটি বাদ্যযন্ত্র মওজুদ ছিল, তিনি উপস্থিত সভাসদগণের মতামত জানিতে চাহিলেন যে, বৃদ্ধকে এখানেই আনিয়া হাজির করা হইবে কিনা। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, বৃদ্ধকে এখানে আনা ঠিক হইবে না। কেননা, সে হয়ত বাদ্যযন্ত্রটি দেখিয়া আগের মতই আচরণ করিয়া বসিতে পারে। পরে খাদেমকে বলা হইল যেন তাহাকে অন্য কক্ষে ডাকিয়া আনা হয়। খাদেম গিয়া তাহাকে বলিল, তোমার খর্জুর আঁটির পুটুলীটি এখানেই রাখিয়া খলীফার নিকট চল। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই তাহার পুটুলী রাখিয়া যাইতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, ইহা আমার রাতের খাবার। খলীফার লোকেরা তাহাকে বলিল, রাতে তোমার আহারের ব্যবস্থা আমরাই করিব। কিন্তু বৃদ্ধ এই প্রস্তাবও ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, রাজবাড়ীর খাবারে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

এদিকে খলীফা এই বিতর্কের কথা জানিতে পারিয়া নিজেই সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন এবং তাহার কথাবার্তা শুনিয়া পুটুলীসহই বৃদ্ধকে ভিতরে লইয়া আসিতে নির্দেশ দিলেন। সেমতে বৃদ্ধকে খলীফার সম্মুখে হাজির করা হইল। এই সময় তাহার চেহারায় ভয়-আতঙ্ক বা দুর্ভাবনার কিছুমাত্র লক্ষণ ছিল না। খলীফা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় মিয়া! তুমি কেমন করিয়া এমন গুরুতর অন্যায় করিলে? বৃদ্ধ পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি অন্যায় করিয়াছি? কিন্তু খলীফা "তুমি আমার বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছ" এই কথা কিছুতেই মুখে আনিতে পারিলেন না। সুতরাং কয়েকবার একই প্রশ্ন করিবার পর বৃদ্ধও অনুরূপ পাল্টা প্রশ্ন করিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ নিজেই বলিলেন, আমি আপনার পিতৃপুরুষকে মিম্বরে দাঁড়াইয়া এই আয়াত পড়িতে শুনিয়াছি–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ·

অর্থঃ "আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ, এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করিতে বারণ করেন।" (সূরা নাহলঃ আয়াত ৯০)

সুতরাং আমি আপনার খাদেমের নিকট অসঙ্গত কাজের একটি যন্ত্র দেখিয়া তাহা ভঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। কেননা, আমাদিগকে উহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বৃদ্ধের মুখে এই জবাব শুনিয়া খলীফা হারুনুর রশীদ একেবারে নিরুত্তর হইয়া গেলেন। অবশেষে তিনি বৃদ্ধকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ শাহী মহল ত্যাগ করিবার পর খলীফা খাদেমের নিকট একটি থলে দিয়া বলিলেন, তুমি বৃদ্ধের পিছনে গিয়া দেখ, সে লোকজনের নিকট আজিকার ঘটনা লইয়া কোন আলোচনা করে কিনা। যদি এই বিষয়ে সে কাহারো সঙ্গে কোন রূপ আলোচনা না করে, তবে এই থলেটি তাহাকে দিয়া দিও। আর যদি কিছু বলে, তবে ইহা ফেরৎ লইয়া আসিও। খাদেম বৃদ্ধের পিছনে গিয়া দেখিল, সে কাহারো সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া নীরবে পথ চলিতেছে। পরে তিনি একটি খেজুরের আঁটি কুড়াইতে থাকিলে খাদেম তাহার নিকট গিয়া বলিল, খলীফা তোমাকে এই থলেটি দিয়াছেন। বৃদ্ধ মস্তক তুলিয়া শান্তভাবে বলিলেন, তুমি খলীফাকে গিয়া বলিও, এই থলে তিনি যেখান হইতে লইয়াছেন সেখানেই যেন রাখিয়া দেন। ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। অবশেষে খাদেম ব্যর্থ হইয়া যখন তথা হইতে ফেরত রওয়ানা হইল, তখন বৃদ্ধ নিম্নোক্ত বয়াতগুলি পাঠ করিতেছিলেন–

ارى الدنيا لمن هي في يديه = هموما كلما كثرت لديه

تهين المكرمين لها بصغر = و تكرم كل من هانت عليه

اذا استغنيت عن شيء فدعه = و خذ ما انت محتاج اليه

অর্থঃ আমি দেখিতে পাইতেছি, যেই ব্যক্তির নিকট দুনিয়া (পার্থিব সম্পদ) বিদ্যমান, তাহার বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তারও কোন অন্ত নাই। যেই ব্যক্তি দুনিয়াকে ইজ্জত করে, দুনিয়া তাহাকে (অবশ্যই) অপমান করিয়া ছাড়ে। পক্ষান্তরে দুনিয়া সেই ব্যক্তিকে সম্মান করে, যেই ব্যক্তি দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তুমি যদি কোন বস্তু হইতে অমুখাপেক্ষী ও বেপরওয়া হও, তবে উহার প্রতারণায় পতিত হইও না। আর তুমি কেবল এমন বস্তুই হাসিল করিও যাহা তোমার জন্য আবশ্যক।

হযরত সুফিয়ান ছাওরীর ঘটনা

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ১৩৬ হিজরীতে খলীফা মাহদী যখন হজ্ব করিতে আসেন, তখনকার সেই দৃশ্য আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। খলীফা যখন তাওয়াফ করিতে শুরু করিলেন, তখন তাহার খাদেমগণ আশেপাশের লোকজনকে চাবুক দ্বারা প্রহার করিয়া তাড়াইতেছিল। এই সময় আমি খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে সুদর্শন যুবক! আমার নিকট আয়মন বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ওয়ায়েল হইতে, ওয়ায়েল কুদামা ইবনে আব্দুল্লাহ আল কেলাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, কোরবানীর দিন তিনি উটের উপর সওয়ার হইয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেছেন। এই সময় লোকেরা না কাহাকেও চাবুক দ্বারা প্রহার করিতেছিল, আর না লোকজনকে তাড়াইয়া তাঁহার জন্য পথ করিয়া দিতেছিল। অথচ তোমার লোকেরা ডানে-বামে লোকদেরকে প্রহার করিতেছে, আর তুমি তাওয়াফ করিতেছ।

খলীফা মাহদী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে, যে আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলিতেছে? লোকেরা জানাইল, ইনি হযরত সুফিয়ান ছাওরী। এইবার খলীফা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আজ যদি আমার স্থলে খলীফা মনসুর হইতেন তবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার ঠোঁট নাড়িবারও সাহস হইত না। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, আমি যদি তোমাকে এই কথা বলিয়া দেই যে, খলীফা মনসুর তাহার কৃতকর্মের জন্য কি শাস্তি পাইয়াছে, তবে তুমিও তোমার এইসব অন্যায় কর্ম পরিত্যাগ করিতে। এই কথা বলিয়াই আমি এক দিকে সরিয়া গেলাম। এই সময় এক ব্যক্তি খলীফাকে বলিল, আপনি কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, লোকটি আপনাকে "আমীরুল মোমেনীন" এর

পরিবর্তে "সুদর্শন যুবক" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল? এই কথা শুনিয়া খলীফা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাকড়াও করিতে নির্দেশ দিলেন। আমি এক জায়গায় আত্মগোপন করিয়া রহিলাম এবং লোকেরা আমার সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেল।

খলীফা মামুনের ঘটনা

একদা খলীফা মামুন এই কথা জানিতে পারিলেন যে, এক ব্যক্তি মুহতাসিবের ভূমিকায় মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়া ফিরিতেছে। অথচ সেই ব্যক্তিকে তিনি এই কাজের অনুমতি প্রদান করেন নাই। পরে তিনি সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। যথা সময় তাহাকে দরবারে হাজির করা হইল। খলীফা মামুন তখন কুরসীতে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত একটি কিতাব পাঠ করিতেছিলেন। তাহার উভয় পা কুরসীর সম্মুখ ভাগে ঝুলিতেছিল। এই সময় কেমন করিয়া কিতাবের অভ্যন্তর হইতে একটি পাতা খসিয়া খলীফার পায়ের নীচে গিয়া পতিত হয়। কিন্তু খলীফা ইহার কিছুই টের পাইলেন না। আগত লোকটি এই দৃশ্য দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! প্রথমে আপনার পা আল্লাহর নামের উপর হইতে সরাইয়া ফেলুন, অতঃপর আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার করুন। কিন্তু খলীফা লোকটির কথার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না যে, আল্লাহর নামের উপর হইতে পা সরাইয়া লওয়ার অর্থ কি? তিনি লোকটিকে বলিলেন, তুমি কি বলিতে চাহিতেছ স্পষ্ট করিয়া বল। লোকটি বলিলেন, আপনি যদি তাহা করিতে না পারেন তবে আমাকে অনুমতি দিন। খলীফা অনুমতি দিলে তিনি সামনে আগাইয়া আসিয়া খলীফার পদতল হইতে সেই কাগজটি উদ্ধার করিয়া তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। উহাতে আল্লাহর নাম লিখিত ছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া খলীফা যারপর নাই মর্মাহত ও লজ্জিত হইলেন। অতঃপর তিনি বেশ কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন এবং তাহার মুখ হইতে একটি কথাও সরিল না। পরে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া লোকটিকে বলিলেন, তুমি আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার করিতেছ, অথচ এই কাজ তো আল্লাহ পাক কেবল আমাদের খান্দানের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তুমি কি সেই আয়াত পাঠ কর নাই, যেই আয়াতে আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

অর্থঃ "তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান

করিলে তাহারা নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিবে।" (সূরা হজ্বঃ আয়াত ৪১)

লোকটি বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও বিপুল সুযোগ দান করিয়াছেন। কিন্তু আপনি এই কথাও ভুলিবেন না যে, আল্লাহ পাক আমাদিগকেও আপনাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী বানাইয়াছেন। এই বাস্তবতাকে সেই ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে, যেই ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর মা'রেফাত হাসিল করিতে পারে নাই। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

অর্থঃ "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তাহারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ হইতে বিরত রাখে।" (সূরা তাওবাঃ আয়াত৭১)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

المؤمن من المؤمن كالبنيان يشـد بعضه بعضا

অর্থঃ "এক মোমেন অপর মোমেনের জন্য এমারতের মত। যেমন এমারতের একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" (বোখারী, মুসলিম)

আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ পাক আপনাকে ভূ-পৃষ্ঠের কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন। আর সৌভাগ্যক্রমে আপনি কোরআন হাদীসের এলেমও হাসিল করিয়াছেন। এখন আপনি যদি কোরআন ও হাদীসের আনুগত্যপূর্বক শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া চলেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি এমন লোকদের কৃতজ্ঞতা আদায় করিবেন যাহারা এই কর্মে আপনাকে সহযোগিতা করিবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি কোরআন-সুন্নাহ হইতে বিমুখ হইয়া শরীয়তের নিষিদ্ধ পথে চলেন, তবে আপনি সুস্পষ্টভাবেই জানিয়া রাখুন আল্লাহর বান্দাগণ অবশ্যই তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন এবং আল্লাহ পাকের কৃত ওয়াদার উপর পরিপূর্ণ আস্থার সহিত তাহারা নিজেদের আমল অব্যাহত রাখিবেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

অর্থঃ "আমি সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।" (সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ৩০)

এখন আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। খলীফা মামুন এই যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়া লোকটিকে বলিলেন, আপনার মত এমন লোকদের পক্ষে "আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার" করিতে কোন

আপত্তি নাই। এখন হইতে আপনি আমার অনুমতি সাপেক্ষেই এই আমল করিতে থাকুন।

মোটকথা, এইসব ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক নহে।

ছেলে পিতাকে আদেশ-নিষেধ করিতে পারিবে কি না

ইহা একটি স্বীকৃত কথা যে, পিতা তাহার ছেলেকে, স্বামী স্ত্রীকে, উস্তাদ তাহার ছাত্রকে, মনিব গোলামকে এবং বাদশাহ তাহার প্রজা সাধারণকে সর্বাবস্থায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে পারিবে। এখন প্রশ্ন হইল– অনুরূপভাবে ছেলে তাহার পিতাকে, স্ত্রী তাহার স্বামীকে, ছাত্র তাহার উস্তাদকে, গোলাম তাহার মনিবকে এবং প্রজা তাহার বাদশাহকে অন্যায় কর্মে বাধা প্রদান করিতে পারিবে কিনা? এই প্রশ্নের জবাব হইল, আমরা বর্ণিত শ্রেণীসমূহের উভয় পক্ষের জন্যই "অসৎ কাজের নিষেধ" স্বীকৃত বলিয়া সমর্থন করি। তবে উহার প্রয়োগ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

উদাহরণ স্বরূপ, পিতার উপর ছেলের "অসৎ কাজের নিষেধ" এর প্রসঙ্গই ধরুন– ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, আদেশ ও নিষেধের পাঁচটি স্তর রহিয়াছে। কিন্তু ছেলের পক্ষে কেবল প্রথম দুইটি স্তরেই জায়েজ। অর্থাৎ মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন (পিতা যদি কোন বিষয় অবগত না থাকেন, তবে সেই বিষয়টি তাহাকে জানাইয়া দেওয়া) এবং দরদ ও মোহাব্বতের সহিত তাহাকে নসীহত করা। আর সেই পাঁচটি স্তরের শেষ দুইটি ছেলের জন্য জায়েজ নহে। সেই দুইটি স্তর হইল, মানুষকে জোরপূর্বক কোন কাজে বাধা দেওয়া এবং ধমকানো বা মারধর করা। আর তৃতীয় স্তরটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন এই স্তরটির অবস্থা হইল, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের এই স্তরটির উপর আমলকারী ব্যক্তি কোন অসৎ ও অনিষ্ট কর্ম দেখিলে তাহা মিটাইয়া দেয়। যেমন, খেল তামাশার দ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র দেখিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা, শরাবের পাত্র ফেলিয়া দেওয়া, ঘরে কোন ছিনতাইকৃত দ্রব্য বা চুরি করা মালামাল থাকিলে তাহা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া, ঘরের দেয়ালে বা ছাদের কার্নিশে কোন প্রাণীর ছবি থাকিলে তাহা মুছিয়া ফেলা কিংবা সোনা-রূপার তৈজস থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা– ইত্যাদি।

এখন কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, অসৎ কাজের নিষেধের এই স্তরটিতে ছেলের এইসব আচরণে পিতার মনে কষ্ট হইবে এবং সন্তানের উপর সে অসন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হইল, ধমকানো ও মারধর করিলে

যেমন পিতা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় না। বরং সংশ্লিষ্ট বস্তুটিই এখানে লক্ষে পরিণত হয়– যদিও ছেলের এইরূপ আচরণে পিতা অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু ছেলের এই কর্মটি হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই ক্ষেত্রে পিতার অসন্তুষ্টি নাহক ও বাতিলের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই কারণেই তাহার অসন্তুষ্টিকে গ্রাহ্য করা হইবে না। কেয়াস ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দাবীও ইহাই যে, এই ক্ষেত্রে ছেলের আচরণ কেবল হক ও বৈধই নহে; বরং উহাকে আবশ্যক ঘোষণা দিয়া বলা হইবে যে, সে যেন এইরূপই করে এবং এই ক্ষেত্রে পিতার অসন্তুষ্টিতে বিব্রত বোধ না করে।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে এতটুকু বিবেচনা করিতে হইবে যে, ছেলে যেই অসৎ কর্মটি দূর করিতে চাহিতেছে, উহার অনিষ্টের পরিমাণ কতটুকু এবং পিতা এই ক্ষেত্রে যেই কষ্ট পাইবেন উহার পরিমাণ কতটুকু। যদি এইরূপ হয় যে, খারাপ কর্মটি খুবই নিকৃষ্ট এবং উহা মিটাইয়া দিলে পিতা কষ্ট পাওয়ার পরিমাণ খুব বেশী নহে; যেমন– এমন ব্যক্তির শরাব ফেলিয়া দেওয়া যেই ব্যক্তি এই কারণে খুব বেশী অসন্তুষ্ট হইবে না, তবে তো নির্দ্বিধায় এই খারাপ কর্মটি মিটাইয়া দেওয়া উচিৎ। পক্ষান্তরে খারাপ কর্মটির অনিষ্ট যদি তুলনামূলক খুব বেশী মারাত্মক না হয় এবং উহা মিটাইয়া দেওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্রোধের মাত্রা খুব বেশী হওয়ার আশংকা হয়, যেমন– কোন মূল্যবান কাঁচপাত্রে হয়ত কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কিত আছে, তো এই ছবির অনিষ্ট নিশ্চয়ই শরাবের অনিষ্টের তুলনায় কম, তা ছাড়া শরাবের তুলনায় কাঁচ পাত্রের মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যারপর নাই ক্ষুদ্ধ ও মর্মাহত হইবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিষয়টাকে বিবেচনায় আনিতে হইবে।

এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোরআন-হাদীসে তো অন্যায়ের প্রতিরোধের বিধানটি সকলের জন্য সমানভাবে বিবৃত হইয়াছে। নির্দিষ্টভাবে কাহারো জন্যই ইহা শিথিল করা হয় নাই। আর মাতাপিতাকে কষ্ট না দেওয়ার বিধানটি নির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যতক্ষণ না তাহারা কোন পাপকর্মে লিপ্ত হয়। অথচ আপনি কি কারণে পিতার প্রতি ছেলের আদেশ-নিষেধের পাঁচটি স্তরের কেবল তিনটিকে অনুমোদন করিয়া অপর দুইটি হইতে তাহাদিগকে পৃথক রাখিতেছেন? অর্থাৎ আপনার মতে পিতা কোন অপরাধে লিপ্ত হইলেও ছেলে তাহাকে ডাঁট-ধমক ও শাসন করিয়া উহা হইতে তাহাকে ফিরাইয়া রাখার চেষ্টা করিতে পারিবে না। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, শরীয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাকে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে রাখিয়াছে। যেমন কোন জল্লাদের পক্ষে ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত তাহার পিতাকে হত্যা করা বা পিতার অন্য কোন শাস্তি প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

অনুরূপভাবে কোন মুসলমান ছেলের পক্ষে তাহার কাফের পিতাকে হত্যা করা জায়েজ নহে। শরীয়তে পিতার হক এই পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন পিতা যদি তাহার ছেলের হস্ত কর্তন করিয়া ফেলে, তবে এই অপরাধের কারণে পিতার উপর কেসাস (প্রতিশোধ গ্রহণের আইন) কার্যকর হইবে না। এমনকি হস্ত কর্তনে প্রতিশোধ হিসাবে ছেলে পিতাকে কোনরূপ কষ্টও দিতে পারিবে না। এই বিষয়ে বহু ঘটনা উল্লেখ আছে এবং এই বিষয়ে কাহারো কোনরূপ মতভেদ নাই। তো মনিব, স্বামী ও বাদশাহর ক্ষেত্রেও এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হইবে। রাজা-প্রজার সম্পর্কটি পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও মনিব-গোলামের সম্পর্কের চাইতেও অধিক নাজুক। বাদশাহকে কেবল প্রথমোক্ত দুইটি স্তরেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাইবে। তৃতীয় স্তরটিকে বিবেচনায় আনিতে হইবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে বাদশাহর খাজানা হইতে মাল বাহির করিয়া প্রকৃত মালিককে ফেরৎ দেওয়া, তাহার ঘর হইতে খেল-তামাশার আসবাব, বাদ্যযন্ত্র ও শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা– ইত্যাদি কর্মগুলি দৃশ্যমান হইবে। আর এই সবের ফলে বাদশাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে। অথচ বাদশাহর ইজ্জত ও সম্মানের পরিপন্থী কোন কাজ করা এমনই নিষিদ্ধ, যেমন কোন পাপ কর্ম দেখিয়া নীরব থাকা নিষিদ্ধ।

এখন প্রশ্ন হইল, এই দুইটি নিষিদ্ধ বিষয়ের কোন্‌টির উপর আমল করা হইবে? এই প্রশ্নের জবাব হইল, অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তই এখানে কার্যকর মনে করা হইবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইজতিহাদ ও বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে, পাপকার্যটি অধিক বিপদজনক, না উহা দূর করা অধিক বিপদজনক। সঠিক ইজতিহাদ ও গভীর বিবেচনার পর যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে উহার উপরই আমল করিবে।

উস্তাদ ও শাগরিদের বিষয়টি খুবই সহজ। কেননা, প্রকৃত পক্ষে এমন উস্তাদই সম্মানের পাত্র যিনি দ্বীনের এলেম ও বিধানের অনুগামী হইবেন। পক্ষান্তরে এমন আলেমের জন্য কোন সম্মান নাই; যিনি নিজের এলেম অনুযায়ী আমল করেন না। সুতরাং একজন শাগরিদের কর্তব্য হইল, উস্তাদের সঙ্গে সেই এলেম অনুযায়ী আচরণ করা যেই এলেম সে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, নিজের পিতার সঙ্গে কেমন করিয়া অন্যায়ের প্রতিরোধ করা হইবে? জবাবে তিনি বলিলেন, পিতাকে আদবের সহিত নসীহত করিতে হইবে। তিনি যদি সেই নসীহতে কর্ণপাত না করেন, তবে নীরব থাকিবে এবং এই বিষয়ে তাহার সঙ্গে কোন তর্ক করিবে না।

পঞ্চম শর্তঃ আদেশ ও নিষেধকারী ক্ষমতাবান হওয়া

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উপর আমল করার পঞ্চম শর্ত হইতেছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কাজে সক্ষম ও ক্ষমতাবান হওয়া। সুতরাং অক্ষম ব্যক্তি কেবল অন্তরের মাধ্যমেই এই বিষয়ের উপর আমল করিবে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে হাত ও মুখ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অক্ষম মনে করা হইবে। যেই ব্যক্তি আল্লাহকে মোহাব্বত করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই পাপাচারকে ঘৃণা করিবে এবং অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ মনে করিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কাফেরের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জেহাদ কর। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে তাহাদের সম্মুখে কেবল এমনভাবে নাক সিঁটকাইবে যেন উহা দ্বারা তোমার অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ পায়। বিষয়টাকে ভাল ভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। অক্ষমতা প্রকাশের জন্য কার্যত অনিষ্টের শিকার হওয়া ও কষ্ট পাওয়া জরুরী নহে; বরং যেই ক্ষেত্রে অনিষ্টের শিকার হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিবে, সেই ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অক্ষম মনে করা হইবে। এমন ব্যক্তিকেও অক্ষম মনে করা হইবে যেই ব্যক্তি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, প্রতিপক্ষ তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং লোকটিকে পাপাচার হইতে ফিরাইয়া রাখার ব্যাপারে তাহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না।

উপরোক্ত দুইটি অবস্থার আলোকে "সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর চারিটি অবস্থা দাঁড়াইল–

(এক) প্রথমতঃ বর্ণিত দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান হওয়া। অর্থাৎ এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে, যাহাকে উপদেশ দিব সে আমার কথা মানিবে না এবং এইরূপ আশংকা হওয়া যে, আমি যদি তাহার মর্জির খেলাফ কিছু বলি, তবে সে আমার উপর চড়াও হইতেও পিছপা হইবে না। এমতাবস্থায় আদেশ ও নিষেধের উপর আমল করা ওয়াজিব নহে। বরং কতক ক্ষেত্রে ইহা হারাম। অবশ্য এইরূপ পরিস্থিতিতে অন্যায় প্রতিরোধকারীর কর্তব্য হইল, এমন স্থানে গমন করা হইতে বিরত থাকা যেখানে অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে গৃহে অবস্থান করিবে এবং একান্ত আবশ্যক না হইলে ঘর হইতে বাহির হইবে না। অবশ্য এমন পরিস্থিতিতে নিজের দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন নিরাপদ স্থানে হিজরত করা ওয়াজিব হইবে না। কেননা দেশ-ত্যাগ কেবল তখনই আবশ্যক হইতে পারে, যখন লোকেরা তাহাকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া এবং সরকারী জুলুম ও নির্যাতনকে সমর্থন দানে বাধ্য করে। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও হিজরতের জন্য শর্ত হইল, তাহার পক্ষে হিজরতের সামর্থ্য থাকিতে হইবে। যেই ব্যক্তি এইসব অনিষ্ট ও জবরদস্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম, তাহার

পক্ষে এই "অনিষ্ট ও জবরদস্তি" ওজরের মধ্যে গণ্য হইবে না।

(দুই) দ্বিতীয় অবস্থা হইল, বর্ণিত দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান না হওয়া। অর্থাৎ কথা ও কর্ম দ্বারা সেই ব্যক্তিকে অপরাধ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহা ফলপ্রসু হইবে এবং সেই ব্যক্তির পক্ষ হইতে কোনরূপ অনিষ্টেরও আশংকা নাই। এই অবস্থায় আদেশ-নিষেধকারীকে যথার্থ ক্ষমতাবান মনে করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে "অন্যায়ের প্রতিরোধ" করা তাহার পক্ষে ওয়াজিব হইবে।

(তিন) তৃতীয় অবস্থা হইল, উপরোক্ত দুইটি অবস্থার একটি বিদ্যমান এবং অপরটি বিদ্যমান না হওয়া। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিলে তাহা ফলপ্রসু হইবে না বটে, তবে উহার কারণে সেই ব্যক্তির পক্ষ হইতে কোনরূপ অনিষ্টেরও আশংকা নাই। এই অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ওয়াজিব নহে, বরং মোস্তাহাব।

(চার) চতুর্থ অবস্থা হইল তৃতীয় অবস্থার বিপরীত। অর্থাৎ "নেহী আনিল মুনকার" তথা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিলে তাহাতে ফল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু কষ্ট পাইতে হইবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি পাথর নিক্ষেপ করিয়া শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে এবং বাদ্যযন্ত্র ও গান বাজনার সরঞ্জাম নষ্ট করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তি ইহাও জানে যে, পাপী লোকটি আমার এই আচরণ নীরবে মানিয়া লইবে না। বরং সে হয়ত আমার নিক্ষিপ্ত পাথরটি দ্বারাই আমার মাথা ফাটাইয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ওয়াজিবও নহে এবং হারামও নহে। বরং মোস্তাহাব। ইতিপূর্বে আমরা জালেম শাসকের সম্মুখে সত্য প্রকাশ সংক্রান্ত যেই বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই শেষোক্ত অবস্থারই উদাহরণ।

অবশ্য এই বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই যে, এই ক্ষেত্রে "অন্যায়ের প্রতিরোধ" অত্যন্ত বিপদজনক। অর্থাৎ– এই ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে যাওয়ার অর্থ হইতেছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের জীবনকে বাজী রাখিয়া সামনে অগ্রসর হইতেছে এবং এই বাজীতে সে যে কোন সময় হারিয়া গিয়া তাহার জীবনের বিপর্যয় ঘটিতে পারে।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, একবার আমি এক খলীফার মুখে এমন কিছু কথা শুনিলাম যাহা ছিল স্পষ্ট গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। আর এই ক্ষেত্রে উহার প্রতিবাদ করাও জরুরী ছিল। এমতাবস্থায় আমি এইরূপ মনস্থ করিলাম যে, আমি খলীফার বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া এই প্রসঙ্গে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহা প্রকাশ করিব। আর এই কথাও আমার জানা ছিল যে, খলীফা আমার এই প্রতিবাদকে অপরাধের মধ্যে গণ্য করিয়া উহার শাস্তি হিসাবে আমাকে হত্যা করিবেন। কিন্তু এই ঘটনাটি যেহেতু এমন এক

মজলিসে ঘটিয়াছিল যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন, ফলে আমার মনে এমন আশংকা হইল যে, আমি হয়ত মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্যকে বেশ যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া পেশ করিব এবং উহার ফলে আমার এই শাহাদাতের পিছনে এখলাসের পরিবর্তে সুখ্যাতি অর্জনই উদ্দেশ্য হইয়া পড়িবে।

একটি আয়াতের মর্ম

উপরে যেই বিষয়টি আলোচনা করা হইল সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আপনি তো বলিতেছেন, প্রাণ হারাইবার আশংকা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মোস্তাহাব। অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন–

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থঃ "এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিও না।"

(সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৯৫)

এই আয়াত দ্বারা জানা যায়, জানিয়া শুনিয়া নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া জায়েজ নহে। এই প্রশ্নের জবাব দানের পূর্বে আমি প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিব, একজন মুসলমানের পক্ষে একা কাফেরদের ভীড়ের মাঝে ঢুকিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে– যেই ক্ষেত্রে তাহার ইহাও জানা আছে যে, এই আক্রমণের পর তথা হইতে কোনক্রমেই সে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না? যদি বলা হয়, এইরূপ অবস্থায়ও ইহা সঙ্গত বটে। তবে আমি প্রশ্ন করিব, এইরূপ করিলে কি তাহা বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী কাজ হইবে না?

আয়াতে বর্ণিত 'তাহলুকা' তথা "ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া" এর অর্থ যদি ইহাই মানিয়া লওয়া হয় যাহা প্রশ্নকর্তা উপলব্ধি করিয়াছে, তবে তো এই আয়াত সেই ব্যক্তির জন্যও প্রতিবন্ধক হইবে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর কথা জানা থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ রচনা করে। কিন্তু আমরা প্রশ্নকর্তার ধারণার সহিত একমত পোষণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের সম্মুখে তো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি বিদ্যমান। তিনি বলিয়াছেন, 'তাহলুকা' অর্থ একাকী শত্রুদের কাতারে ঢুকিয়া পড়িয়া আক্রমণ করা নহে। বরং উহার অর্থ হইতেছে– আল্লাহর আনুগত্য করিতে গিয়া খানাপিনা ত্যাগ করা। অর্থাৎ আহারাদি ত্যাগ করিয়া নিজের জানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। এদিকে হযরত বারা ইবনে আজিব (রাঃ) বলেন, 'তাহলুকা' বা নিজেকে নিজে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে– গোনাহ ও

পাপাচারে লিপ্ত থাকা আর এইরূপ মনে করা যে, আমার তওবা যেহেতু কবুল হইবে না, সুতরাং আমি তওবা করিব না। হযরত ওবায়দা (রাঃ) বলেন, 'তাহলুকা' হইতেছে– গোনাহ করা এবং উহার পর কোন নেক আমল না করা এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া।

মোটকথা, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইবার নিশ্চিত আশংকার পরও শত্রুর উপর আক্রমণ করা এবং তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করা যেহেতু জায়েজ, সুতরাং অন্যায়ের প্রতিরোধ করাও জায়েজ হওয়া উচিত– যদিও সেই ক্ষেত্রে প্রাণ হারাইবার আশংকা থাকে। অবশ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি এইরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, আক্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষের কিছুমাত্র ক্ষতি করা যাইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আক্রমণ করা জায়েজ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন অন্ধ ও প্রতিবন্ধির পক্ষে একা শত্রু বাহিনীর উপর হামলা করা। প্রকাশ থাকে যে, একজন অন্ধ বা মাজুর ব্যক্তি রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করিয়া কেবল নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিবে না। এমন ব্যক্তির পক্ষে শত্রুর উপর আক্রমণ করা জায়েজ নহে।

অবশ্য শত্রু বাহিনীর উপর একাকী আক্রমণ করা এমন ক্ষেত্রে জায়েজ হইবে, যখন আক্রমণকারীর এমন নিশ্চিত বিশ্বাস থাকিবে যে, এই আক্রমণে আমি বিপুল সংখ্যক শত্রুকে হত্যা করিয়া তবে নিহত হইব। কিংবা আক্রমণকারী যদি এই বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, আমি যদিও কাহাকেও হত্যা করিতে পারিব না, কিন্তু রণাঙ্গনে আমি এমন ক্ষিপ্রতার সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িব যে, উহার ফলে শত্রুপক্ষ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং আমার এই বীরত্ব দেখিয়া তাহারা অপরাপর মুসলমানদের সম্পর্কেও এইরূপ ধারণা পোষণ করিবে যে, নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যেও এইরূপ জযবা ও বীরত্ব বিদ্যমান এবং তাহারাও আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণের ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন শক্তির কিছুমাত্র পরওয়া করিবে না।

অনুরূপভাবে ইহ্‌তিসাব তথা অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও যদি এইরূপ লক্ষ্য স্থির করা হয় এবং অনুরূপ ফলপ্রাপ্তির আশাও করা যায় তবে উহাকেও বর্ণিত জেহাদের মত কেয়াস করিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে। অর্থাৎ জেহাদের ক্ষেত্রে বর্ণিত অবস্থায় যেমন প্রাণ হারাইবার নিশ্চিত আশংকার পরও আক্রমণ করা জায়েজ, তদ্রূপ অন্যায়ের প্রতিরোধ করাও জায়েজ হইবে। বরং প্রতিরোধের ফলে পাপী লোকেরা পাপাচার হইতে বিরত হইবে বা তাহাদের অন্যায় প্রভাব প্রশমন হইবে কিংবা তাহার এই তৎপরতা দেখিয়া মুসলমানদের অন্তরে শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে; তবে তাহার পক্ষে যাবতীয় প্রতিকুলতা ও জীবনাশংকার পরওয়া না করিয়া অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মোস্তাহাব হইবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে অপর যেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে তাহা হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া প্রতিপক্ষ হইতে সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকা যেন কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ যদি এইরূপ আশংকা হয় যে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া কেবল আমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইব না; বরং আমার সঙ্গে আমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা জায়েজ নহে। কেননা, উহার ফলে যেন একটি অন্যায় দমন করা হইবে অপর একটি অন্যায়ের মাধ্যমে। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্যায়ের প্রতিরোধে ক্ষমতাবান মনে করা হইবে না। কেননা, অন্যায়ের প্রতিরোধের উদ্দেশ্য হইতেছে, সার্বিকভাবেই অন্যায়ের দমন। অর্থাৎ এমন নহে যে, একটি অন্যায় দমন করিয়া অপর একটি অন্যায়ের জন্ম দেওয়া।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপ– এক ব্যক্তির নিকট হালাল শরবত ছিল। ঘটনাক্রমে উহাতে কোন ময়লা পতিত হওয়ার কারণে উহা নাপাক হইয়া যায়। এখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, আমি যদি এই শরবত ফেলিয়া দেই, তবে সেই ব্যক্তি শরাব পান করিতে শুরু করিবে। অর্থাৎ উহার অর্থ যেন একটি অন্যায় দমন করিতে গিয়া অপর একটি অনিষ্টের জন্ম দেওয়া হইবে। সুতরাং এমতাবস্থায় নাপাক ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অবশ্য এক শ্রেণীর লোকের মতামত হইল, এই ক্ষেত্রে নাপাক ফেলিয়া দেওয়াই উত্তম। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি শরবতের অভাবে শরাব পান করিতে শুরু করে, তবে উহার দায়-দায়িত্ব তাহার নিজের। অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি এই জন্য দায়ী নহে। সে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণায় এই মতামতও ঠিক নহে। আমরা মনে করি, এই মাসআলাটিও সেইসব মাসায়েলের অন্তর্ভুক্ত, যেই ক্ষেত্রে সঠিক ইজতেহাদের উপর ফায়সালা করা হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি নিজে খাওয়ার জন্য অপর কাহারো একটি বকরী জবাই করিতেছে। এখন অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, আমি যদি তাহাকে এই কাজে বাঁধা দেই, তবে সে এই বকরীর পরিবর্তে অপর কোন মানুষকেই জবাই করিয়া খাইতে শুরু করিবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাহাকে বকরী জবাই করিতে বাধা না দেওয়াই কর্তব্য। কিংবা মনে করুন, এক ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিতেছে। এখন অসৎ কাজের বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, আমি যদি তাহাকে এই অন্যায় হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করি, তবে হত্যার পরিবর্তে সে ঐ ব্যক্তির মালামাল ছিনাইয়া লইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে নিবৃত্ত করাই বিধেয়। অর্থাৎ এই জাতীয় সূক্ষ্ম অবস্থায় সঠিক ইজতিহাদের উপর আমল করিতে হইবে।

সুতরাং বর্ণিত সূক্ষ্ম অবস্থাসমূহের কারণেই আমরা বলি, এই জাতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার না করাই

ভাল। তাহারা বরং এমন সব বিষয়ে আমর ও নেহী করিবে যাহা সকলের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য এবং কোনরূপ সূক্ষ্মতার আবরণে আবৃত নহে। যেমন শরাব পান, ব্যভিচার ও নামাজ তরক ইত্যাদি কর্মে বাধা প্রদান করা। কেননা, কোন কোন কর্ম এইরূপ আছে, বাহ্য দৃষ্টিতে যেইগুলিকে পাপাচার ও গোনাহের কাজ বলিয়াই মনে হইবে। অথচ প্রকৃত পক্ষে সেইগুলিতে কোনরূপ গোনাহের মিশ্রণ থাকে না। তো সাধারণ মানুষ যদি এইরূপ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে, তবে হিতে বিপরীত ও কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই কারণেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য শাসনকর্তার অনুমতির শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। কেননা, এই শর্ত আরোপ করা না হইলে হয়ত দেখা যাইবে, এমনসব লোকেরাও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ শুরু করিয়া দিয়াছে, যাহারা নিজেদের এলেমের দৈন্য ও দক্ষতার অভাবে এই কাজের যথাযোগ্য পাত্র নহে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে– ইনশাআল্লাহ।

সুস্পষ্ট অবগতি বনাম ধারণা

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইতিপূর্বে আপনি আলোচনা করিয়াছেন, অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যদি প্রতিপক্ষ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এলেম থাকে, তবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাইবে না। এখানে এই এলেম ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধকারী যদি ক্ষতির আশংকা সম্পর্কে এলেমের পরিবর্তে কেবল 'ধারণা' পোষণ করে, তবে এই ক্ষেত্রে কি হুকুম? এই প্রশ্নের জবাব হইল এইরূপ ক্ষেত্রে প্রবল ধারণাকে এলেমের পর্যায়ে মনে করা হইবে। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এলেম ও ধারণা একটি অপরটির বিপরীত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে নিশ্চিত এলেমকে ধারণার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে এলেম ও ধারণার হুকুম পৃথক পৃথক।

উদাহরণতঃ কোন ক্ষেত্রে যদি অন্যায়ের প্রতিরোধকারী এই কথা জানিতে পারে যে, এখানে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিয়া কোন কাজ হইবে না, তবে এই ক্ষেত্রে তাহার উপর হইতে এই দায়িত্ব রহিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে অন্যায়ের প্রতিরোধে কাজ না হওয়ার বিষয়ে যদি তাহার প্রবল ধারণা হয়, আবার কাজ হওয়ার কিছুটা সম্ভাবনাও বিদ্যমান থাকে এবং একই সঙ্গে যদি ইহাও সে জানিতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতিরও আশংকা নাই; তবে এমতাবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাইবে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশের মতে এই ক্ষেত্রেও অন্যায়ের প্রতিরোধ ওয়াজিব হওয়া চাই। কেননা, এই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা নাই এবং

উপকার হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বস্তুতঃ আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার সংক্রান্ত কোরানিক দলীলসমূহ দ্বারা ইহা আমভাবে ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণিত হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষ ইহার 'ব্যতিক্রম' এজমা ও কেয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়। কেয়াস হইল এই যে, এই আদেশ ও নিষেধ সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নহে; বরং যেই ব্যক্তির উপর এই আদেশ ও নিষেধ প্রয়োগ করা হইবে, সেই ব্যক্তিই উহার মূল লক্ষ্য। সুতরাং এই বিষয়টি যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোনভাবেই এই আদেশ ও নিষেধ কবুল করিবে না, তবে এই ক্ষেত্রে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও ওয়াজিব হইবে না। পক্ষান্তরে উহা কার্যকর হওয়ার ক্ষীনতম সম্ভাবনাও যদি থাকে, তবে এই ওয়াজিব রহিত হইবে না।

মোটকথা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে যদি প্রতিপক্ষ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তবে উহার উপর আমল করা ওয়াজিব হইবে না। আর ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার বিষয়ে যদি প্রবল ধারণা থাকে, তবে উহার উপর আমল করা ওয়াজিব হইবে। অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দুর্বল সম্ভাবনার কারণে এই ওয়াজিব রহিত হয় না। কেননা, এই ধরনের সম্ভাবনা তো যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই হইতে পারে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে বিষয়টাকে বিবেচনায় আনা যাইতে পারে।

সাহস ও ভীতির মাপকাঠি

প্রকাশ থাকে যে, কোন কাজে অনিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাহস ও দুর্বল চিত্ততার কারণে বিভিন্ন রকম হইতে পারে। দুর্বলচিত্ত ও ভীতু মানুষ তো দূরের ক্ষতিকেও নিকটে মনে করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বীর পুরুষ ও সাহসী ব্যক্তি কোন অনিষ্টকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমলেই আনে না, যতক্ষণ না তাহা অনুষ্ঠিত হয়। আবার অনেক সময় তো সাহসী লোকেরা অনিষ্টে আক্রান্ত হওয়ার পরও সাহস হারায় না। এখন এই প্রসঙ্গে কোন্ ব্যক্তিকে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হইবে? এমন ভীতু ব্যক্তি, যে বিপদের সম্ভাবনাতেই ভীত হইয়া পড়ে, না এমন সাহসী ব্যক্তিকে, যে বিপদ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও সাহস হারায় না তাহাকে? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, সুস্থ বিবেক-বিবেচনা ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিই এই ক্ষেত্রে মানদণ্ড। ভীতু ব্যক্তির দুর্বল মনোবল এমন একটি ব্যাধি, যাহা মানুষকে শক্তিহীন করিয়া দেয়। এদিকে অসঙ্গত সাহসও বর্ণিত ভারসাম্যপূর্ণ মনোবলের পরিপন্থী এবং উহার ফলেও মানুষ বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। এই দুইটি অবস্থাই বর্জনীয় এবং এই ক্ষেত্রে

কেবল ভারসাম্যপূর্ণ মনোবলই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাটিই হইল যথার্থ বীরত্ব। অবশ্য অনেক সময় এই যথার্থ বীর পুরুষগণও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ত্রুটির শিকার হয় এবং অনিষ্টকর অবস্থা চিহ্নিত করিতে ব্যর্থ হইয়া অসঙ্গত সাহস করিয়া বসে। এইরূপ অসঙ্গত দুঃসাহসের কারণ হইল জেহালাত ও মূর্খতা। আবার অনেক সময় অনিষ্ট দমনের মওকা না বুঝিবার কারণেও এইরূপ লোকেরা সাহস হারাইয়া ফেলে। উহা কারণও সেই মূর্খতাই। আরেকটি অবস্থা হইল– অনেক সময় মানুষ অনিষ্টের মওকা এবং উহার দমনের উপায় ও তদ্বির সম্পর্কে অবগত থাকে বটে এবং এই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাও থাকে; কিন্তু অন্তরের দুর্বলতার কারণে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে না। দূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহার মনের উপর এমন প্রভাব ফেলে, যেমন একজন সাহসী ব্যক্তির অন্তরে নিকট ভবিষ্যতের আশংকায় হইয়া থাকে। এই কারণেই আমরা বলিয়াছি, অসঙ্গত সাহস কিংবা মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা এই দুইটির কোনটিই কাম্য নহে; বরং এই ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য অবস্থা হইল সুস্থ বিবেক-বিবেচনা ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোবল। সুতরাং ভীতু ব্যক্তির কর্তব্য হইল, তাহার মনের ভয় প্রশমনের চিকিৎসা করা এবং যেই কারণে মনে ভয় পয়দা হইতেছে তাহা দূর করা। সেই কারণটিই হইল মূর্খতা কিংবা মনের দুর্বলতা। মূর্খতা দূর হয় অভিজ্ঞতা দ্বারা আর মনের দুর্বলতা দূর হয় সেই কর্মটি পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা অন্তরে ভীতি সৃষ্টির মূল কারণ। অর্থাৎ কোন কাজ বার বার করিলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং এই অভ্যাসের ফলে অন্তরে শক্তি পয়দা হয়। এই কারণেই দেখা যায়– প্রাথমিক ছাত্রগণ মোনাজারা-বিতর্ক ও বক্তৃতার নাম শুনিলেই ভয় পায় এবং লোকসমাগমে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু ক্রমাগত কিছু দিন অভ্যাস করিবার পর যখন এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা পয়দা হয়, তখন মনের দুর্বলতা ও মুখের জড়তা ইত্যাদি দূর হইয়া লক্ষ মানুষের সম্মুখে অনর্গল বক্তৃতা করিতেও কোন সমস্যা হয় না।

এখন কোন ব্যক্তির মনোবল যদি এমনই দুর্বল হয় যে, কোন ভাবেই তাহা দূর করা সম্ভব হইতেছে না, তখন তাহার অবস্থার প্রেক্ষিতেই তাহার উপর মাসআলা প্রয়োগ হইবে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে শরীয়তের অনেক আবশ্যকীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে মাজুর (অপারগ) মনে করা হয়। তদ্রূপ, মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিকে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার পালনের ক্ষেত্রে মাজুর মনে করা হইবে। এই কারণেই আমরা বলি, কোন দুর্বলমনা ব্যক্তি যদি কোনভাবেই সমুদ্রে সফর করিতে সাহস না করে, তবে তাহার পক্ষে (সমুদ্র সফরের মাধ্যমে) হজ্জ করা ফরজ হইবে না।

অনিষ্ট ও ক্ষতির মাত্রা

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উপরের আলোচনায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হইতে যেই অনিষ্ট ও ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার মাত্রা বা পরিমাণ কি? সকল মানুষের অবস্থা তো এক রকম নহে। কেহ হয়ত সামান্য কটু কথা দ্বারাই বেশ আঘাত পায়। কেহ আঘাত পায় প্রহার করিলে। আবার এমন মানুষও আছে, যাহারা কোনক্রমেই ইহা সহ্য করিতে পারে না যে, মানুষ তাহার নামে গীবত-শেকায়েত বা সমালোচনা করুক। অর্থাৎ মানুষের পক্ষ হইতে অনিষ্ট ও ক্ষতির শিকার বা কষ্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে সকলের অনুভূতি এক রকম নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হইতে অনিষ্ট, ক্ষতি বা কষ্ট পাওয়ার এমন একটি মানদণ্ড থাকা উচিৎ যাহা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে এবং উহা বিদ্যমান অবস্থায় যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার বৈধতা নির্ধারণ করা যায়।

বস্তুতঃ উপরোক্ত প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। কেননা, অনিষ্ট ও ক্ষতির ধরণ-প্রকরণ যেমন ব্যাপক, তদ্রূপ উহার প্রয়োগস্থলও অনেক। কিন্তু তবুও এই বিষয়ে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করিব যেন এই বিষয়ে কোনরূপ অসঙ্গতি, অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, অনিষ্ট হইল মানুষের চাহিদার পরিপন্থী বিষয়। দুনিয়াতে মানুষের চাহিদা মোট চারি প্রকার। যেমন, এলেম- স্বাস্থ্য, সম্পদ ও প্রভাব। আত্মার চাহিদা হইল এলেম ও বিদ্যা। দেহের চাহিদা স্বাস্থ্য। সম্পদের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য এবং মানুষের অন্তরে ইজ্জত ও প্রভাব বিস্তারও মানুষের চাহিদা। প্রভাবের অর্থ হইতেছে মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া। অর্থাৎ মানুষ যেমন সম্পদের মালিক হইয়া উহা নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করে, তদ্রূপ প্রভাবের মাধ্যমেও মানুষের অন্তরের কর্তৃত্ব হাসিল করিয়া উহা দ্বারা মানুষ নিজের কার্যোদ্ধার করিতে পারে।

উপরে বর্ণিত চারিটি বিষয় মানুষ কেবল নিজের জন্যই কামনা করে না, বরং মানুষ উহা নিজের ঘনিষ্ঠজনদের জন্যও প্রত্যাশা করে। মানুষের চাহিদার এই চারিটি বিষয়ের পাশাপাশি আরো দুইটি বিষয় তাহার নিকট খুবই অনাকাংখিত।

প্রথমতঃ যাহা হাসিল হইয়াছে তাহা বিনষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ যাহা এখনো হাসিল হয় নাই বরং হাসিল হওয়ার আশা আছে, সেই প্রত্যাশিত বস্তুটি হাসিল না হওয়া। প্রত্যাশিত বলা হয় এমন বস্তুকে যাহা হাসিল হওয়া সম্ভব। তো যেই বস্তুটি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান, উহা যেন প্রাপ্ত

বস্তুর মধ্যেই গণ্য। সুতরাং এহেন সম্ভাবনা নাকোচ হওয়াও যেন প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হওয়ার মধ্যে গণ্য। এক্ষণে এই পর্যালোচনার অর্থ দাঁড়াইতেছে, অনিষ্ট ও ক্ষতি কেবল দুই প্রকার-

প্রথম প্রকার অনিষ্ট

প্রথম প্রকার অনিষ্ট হইল প্রত্যাশিত বস্তু না পাওয়ার আশংকা, এই ক্ষেত্রে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বর্জন করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না। এই পর্যায়ে আমরা উপরে আলোচিত মানুষের চাহিদার চারিটি বিষয়ের মধ্যে এই জাতীয় অনিষ্টের আশংকার উদাহরণ পেশ করিব।

(এক) এলেমের অনিষ্টের আশংকাঃ মনে করুন, কোন ব্যক্তি তাহার উস্তাদের ঘনিষ্ঠজনদেরকে অন্যায় কাজ করিতে দেখিয়াও এই আশংকায় বাধা দেয় না যে, এইরূপ করিলে হয়ত সেই ব্যক্তি আমার উস্তাদের নিকট গিয়া আমার নামে বদনামী করিবে এবং উহার ফলেই তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে শিক্ষা দান হইতে বিরত থাকিবেন।

(দুই) স্বাস্থ্যের অনিষ্টের আশংকাঃ উহার উদাহরণ হইল- যেমন এক ব্যক্তি কোন চিকিৎসকের নিকট গেল এবং তাহার গায়ে রেশমী পোশাক দেখিয়াও এই আশংকায় তাহাকে কিছু বলিল না যে, সে মনে করিল, আজ তাহাকে এই কাজে বাধা দেওয়ার পর অভিষ্যতে কোন দিন যদি আমি তাহার নিকট চিকিৎসার জন্য আসি, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমার চিকিৎসা করিবেন না।

(তিন) সম্পদের অনিষ্টের উদাহরণ এইরূপঃ শাসনকর্তা, আমীর উমারা ও বিত্তবানদিগকে অন্যায় করিতে দেখিয়াও কেবল এই আশংকায় বাধা না দেওয়া যে, হয়ত উহার ফলে ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষ হইতে আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ হইয়া যাইবে।

(চার) প্রভাবের ক্ষেত্রে উদাহরণঃ কোন মানুষকে অপরাধ করিতে দেখিবার পরও কেবল এই কারণে বাধা না দেওয়া এবং দেখিয়াও না দেখার ভান করা যে, এইরূপ করিলে হয়ত ভবিষ্যতে আমি তাহার সহযোগিতা ও সমর্থন হারাইব এবং তাহার সমর্থনের অভাবে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইব।

উপরে যেই চারি প্রকার আশংকার কথা উল্লেখ করা হইল, এইসব আশংকার কারণে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকা যাইবে না। কেননা, বর্ণিত উদাহরণ সমূহে কতক অনাবশ্যক ও বাহুল্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত হওয়া ইহা অপ্রাকৃত। অর্থাৎ ইহাকে প্রকৃত অনিষ্ট বলা যাইবে না। কেননা, প্রকৃত অনিষ্ট

হইল– নিজের মালিকানাধীন কোন বস্তু বিনষ্ট হওয়া। অবশ্য এইসব অতিরিক্ত ও বাহুল্য বিষয় সমূহের মধ্যে কেবল এমন কতক বিষয়কে 'ব্যতিক্রম' মনে করা যাইবে যাহা মানুষের জন্য একান্ত অপরিহার্য এবং যাহা হইতে বঞ্চিত হওয়ার 'অনিষ্ট' সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বর্জন করার 'অনিষ্ট' অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রমাণিত। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার আশা আছে। সেই সঙ্গে তাহার ইহাও জানা আছে যে, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে বিলম্ব হইলে তাহার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হইয়া বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটিতে পারে। এখানে 'জানা আছে' দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হইল, 'জন্নে গালেব' বা প্রবল ধারণা। অর্থাৎ ইহা এমন ধারণা যেই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া পানির ব্যবহার বর্জন করিয়া তাইয়াম্মুম করা বৈধ হয়। তো এই ক্ষেত্রেও যদি এইরূপ প্রবল ধারণা হয়, তবে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার অনুমতি আছে। ইহা হইল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অনিষ্টের উদাহরণের ব্যাখ্যা।

এলেমের ক্ষেত্রে অনিষ্টের উদাহরণের ব্যাখ্যা হইল– মনে করুন, এক ব্যক্তি দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস ও মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ। এদিকে গোটা এলাকার মধ্যে কেবল এমন একজন আলেম আছেন যিনি তাহাকে এইসব বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। অর্থাৎ এলাকায় আরো কতক আলেমও আছেন বটে, কিন্তু তাহাদের নিকট সে গমন করিতে সক্ষম নহে। এই ব্যক্তি ইহাও জানে যে, সে যেই ব্যক্তির উপর 'নেহী আনিল মুনকার' করিতে চাহিতেছে, সে ঐ আলেমের ঘনিষ্ঠজন এবং সে ইচ্ছা করিলেই ঐ আলেমকে এই বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে যে, তিনি যেন তাহাকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দান হইতে বিরত থাকেন। অর্থাৎ এই পর্যায়ে এখানে দুইটি নিষিদ্ধ বিষয় একত্রিত হইল। প্রথমতঃ ধর্মীয় জ্ঞান বা দ্বীনের জরুরী মাসায়েল হইতে অজ্ঞ থাকা– ইহাও নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় কেয়াসের দাবী হইল, কোন একটি দিককে প্রাধান্য দেওয়া। অন্যায় কর্মটি যদি নেহায়েতই যঘন্য হয়, তবে উহা প্রতিরোধ করাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। পক্ষান্তরে দ্বীনের এলেম হাসিল করার বিষয়টি যদি তদাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাখ্যা হইলঃ মনে করুন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি কামাই-রোজগার করিতে অক্ষম এবং মানুষের নিকট হাত পাতারও তাহার অভ্যাস নাই। এদিকে আসবাবের উসিলা বর্জন করিয়া কেবল আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার আত্মিক শক্তিও তাহার অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় শহরের একমাত্র ব্যক্তিটি যে তাহার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে, তাহার অন্যায় কাজে যদি সে বাধা দেয় তবে এমন আশংকা আছে যে, সে হয়ত তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া সাহায্য বন্ধ করিয়া

দিবে। ফলে বাধ্য হইয়া হয় তাহাকে হারাম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে কিংবা অভাবের তাড়নায় তাহার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিবে। এমন অপারগ ক্ষেত্রেও অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকা যাইবে।

প্রভাবের ক্ষেত্রে অনিষ্টের ব্যাখ্যাঃ মনে করুন, কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক হয়ত কোন আদেশ-নিষেধকারী ব্যক্তির পিছনে লাগিয়া আছে। কিভাবে তাহাকে জ্বালাতন করা যায় এই তাহার ফিকির। এখন এই দুষ্ট লোকের অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইল, বাদশাহর দরবারে হাজির হইয়া এই বিষয়ে তাহার নিকট অভিযোগ করা। কিন্তু বাদশাহর দরবারে গমন করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে একমাত্র যেই ব্যক্তিটি তাহাকে এই কাজে সহযোগিতা করিতে পারে, সেই লোকটি শরীয়ত গর্হিত বিবিধ কর্মে লিপ্ত। এখন সেই ব্যক্তিকে যদি এই কাজে বাধা দেওয়া হয়, তবে সে এই কাজে তো তাহাকে সহযোগিতা করিবেই না, বরং এই ক্ষেত্রে এমনও আশংকা আছে যে, লোকটি হয়ত তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহর নিকট পাল্টা তাহার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিয়া বসিবে। এমন পরিস্থিতিতেও অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার অনুমতি আছে।

মোটকথা, এই জাতীয় অপারগতা ও জরুরতের ক্ষেত্রে উহাকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করা হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে অপারগতা ও জরুরত কোন্‌টি তাহা অন্যায় প্রতিরোধকারীর ইজতিহাদের উপর নির্ণিত হইবে। অর্থাৎ এইরূপ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের মনের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিবে। এক দিকে নিজের অক্ষমতাজনিত জরুরত এবং অপর দিকে মুনকার তথা অসৎ কর্মটি যঘন্যতা– এই দুইটি বিষয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইবে। অতঃপর পরিপূর্ণ সততা ও আমানতদারীর সহিত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তুলনা করিয়া যে কোন একটিকে প্রাধান্য দিবে। এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যেন কোন অবস্থাতেই নিজের ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য না পায় তৎপ্রতি সতর্ক থাকিবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জনপূর্বক নীরব থাকার নাম বিনয়। আর নিজের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার নাম শঠতা। এই ক্ষেত্রটি অত্যন্ত জটিল ও নাজুক। সুতরাং মোমেনের কর্তব্য হইল, এহেন পরিস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তে নিজের আত্মা ও ক্বলবের নেগরানী করা। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করা যে, আল্লাহ পাক আমাদের দিলের হালাত দেখিতেছেন এবং আমাদের প্রতিটি কাজের হাকীকত সম্পর্কে তিনি অবগত। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির আনুগত্য করিতেছি, না নিজের স্বার্থের আনুগত্য করিতেছি, এই সব বিষয় তাহার নিকট গোপন রাখিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার নিকট প্রতিটি নেক আমল ও বদ আমলের প্রতিদান বিদ্যমান এবং এই বিষয়ে তিনি কোনরূপ অবিচার করেন না।

দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট

দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট হইল, নিজের মালিকানাধীন কোন সম্পদ নষ্ট হইয়া যাওয়া। ইহা প্রকৃত অনিষ্ট বটে। ইতিপূর্বে মানুষের চাহিদার যেই চারিটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে উহার মধ্যে কেবল এলেম ব্যতীত অপর তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহা "অন্যায়ের প্রতিরোধ" রহিত হওয়ার কারণ হইতে পারে। এলেম এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হইল, এলেম আল্লাহ পাকের দেওয়া এক নেয়মত। কোন মানুষ এই নেয়মতের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলেই কাহারো এলেম ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে মূর্খতায় নিক্ষেপ করিতে পারে না। এই এলেমের ফজিলত এমনই অন্তহীন যে, দুনিয়াতে যেমন এই এলেমের কোন বিনাশ নাই; তদ্রূপ আখেরাতেও উহার স্থায়ী সুফল ভোগ করা যাইবে।

প্রহার ও শারীরিক নির্যাতনের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং কোন মানুষ যদি ইহা জানিতে পারে যে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গেলে তাহার উপর কঠিন নির্যাতন করা হইবে এবং উহার ফলে সে চির দিনের জন্য পঙ্গুও হইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার পক্ষে অন্যায়ের প্রতিরোধ ওয়াজিব নহে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে তাহা মোস্তাহাবের পর্যায়ে থাকিবে।

সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ব্যাখ্যা হইলঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পূর্বাহ্নে এই বিষয়ে অবগত হওয়া যে, আমি যদি অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে তৎপর হই, তবে আমার বিষয়-সম্পদ লুট করা হইবে কিংবা আমার বাড়ী-ঘর ও ফসলাদি জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে ইত্যাদি। তো এইরূপ পরিস্থিতিতে নেহী আনিল মুনকার ওয়াজিব হইবে না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও তাহা মোস্তাহাবের পর্যায়ে থাকিবে। তবে সর্বাবস্থায় যেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা এই যে, একজন মোমেনের ঈমানের দাবী হইল, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকা।

এখানে আরেকটি জরুরী বিষয় হইল, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে গিয়া আঘাত পাওয়া বা সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার বিষয়টি এক পর্যায়ের নহে। বরং উহারও কতক শ্রেণী রহিয়াছে। অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ যদি নেহায়েতই মামুলী হয়, যেমন প্রতিপক্ষ হয়ত তাহার দুই/চার পয়সা ছিনাইয়া লইল বা মামুলী ধরনের একটি থাপ্পড় দিল ইত্যাদি। তো এই জাতীয় ক্ষতির কোন পরওয়া করা যাইবে না এবং এইরূপ ওজরের কারণে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকার অনুমতি নাই। কিন্তু এই ক্ষতির পরিমাণ যদি যথার্থই মারাত্মক হয়, তবে এই ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকার বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা হইবে। আরেকটি ক্ষতি হইল মধ্যম পর্যায়ের। অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণটি নেহায়েত মামুলীও নহে আবার তেমন মারাত্মকও নহে; এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করা যাইবে কিনা, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুব কঠিন। সুতরাং দ্বীনদার-পরহেজগার ব্যক্তি নিজের সঠিক ইজতিহাদ ও গভীর বিচার-বিশ্লেষণের পর যথাসম্ভব দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে গিয়া নিজের ইজ্জত ও সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার উদাহরণ এইরূপ– মনে করুন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজের একজন বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কারণে প্রকাশ্য লোকসমাগমে তাহাকে মারধর করা হইল। অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালাগাল করা হইল এবং তাহার রুমালটি গলায় জড়াইয়া শহরের অলিগলিতে ঘুরানো হইল। তাহার চেহারায় কালি লেপনপূর্বক গাধার পিঠে চড়াইয়া তামাশা করা হইল।

কিন্তু তাহাকে যদি ভয়ানক মারধর করা হইয়া থাকে, তবে ইহা তাহার স্বাস্থ্য বিনষ্টের উদাহরণ। অবশ্য শারীরিক নির্যাতন যদি মামুলী ধরনের হয়, তবে উহার ফলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে না বটে, কিন্তু উহার ফলেও যথেষ্ট মানহানী ঘটে। অর্থাৎ এইরূপ মামুলী প্রহারে সাধারণতঃ দেহের উপর বিশেষ কষ্ট না হইলেও মনের উপর তাহা প্রচণ্ডভাবেই ক্রিয়া করে এবং মানসিক যাতনা দেহের উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তো অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া মানহানীর শিকার হওয়ারও কয়েকটি স্তর রহিয়াছে। উহার যেই স্তরটিকে আমরা 'বেইজ্জতি' বলিয়া অভিহিত করিব, উহা হইল– অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কারণে মুখে চুন-কালি মাখিয়া খালী পা ও খালী মাথায় শহরের অলিগলিতে ঘুরানো ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার অনুমতি আছে। কেননা, শরীয়তে নিজের ইজ্জত হেফাজতের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অপমান ও মানহানীর বিষয়টি যে কোন অনিষ্ট অপেক্ষা গুরুতর।

দ্বিতীয় স্তর হইল, ইজ্জত ও সম্মান মুলতবী হওয়া কিন্তু বেইজ্জতি না হওয়া। উদাহরণ স্বরূপঃ এক ব্যক্তি বেশ সাজ-গোজ করিয়া উত্তম পোশাক পরিধান পূর্বক ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া পথে বাহির হইয়াছে। এই ব্যক্তি ইহা ভাল করিয়া জানে যে, আমি যদি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করি, তবে আমাকে ঘোড়া ত্যাগ করিয়া সাধারণ পোশাকে পথ চলিতে হইবে। অথচ এইভাবে চলিতে সে অভ্যস্থ নহে। এখন এই উত্তম পোশাক ও সওয়ারী অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে গণ্য এবং শরীয়তে ইহা পছন্দনীয় নহে। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিরোধের কারণে এইসব বিষয় তরক করিতে হইলেও কোন

পরওয়া করা যাইবে না। নিজের ইজ্জত ও সম্মানের হেফাজত করা উত্তম বটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাহুল্যতার হেফাজতে নিমগ্ন হওয়া পছন্দনীয় নহে।

অনুরূপভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিলে মানুষ আমাকে তিরস্কার করিবে, আহাম্মক-নির্বোধ ও রিয়াকার বলিয়া মন্তব্য করিবে, আমার গীবত করা হইবে, আমার ভক্ত-অনুরক্ত ও স্বজনদিগকে আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলা হইবে– ইত্যাদি অজুহাতের কারণেও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব এড়ানো যাইবে না। কেননা, সত্যিকার অর্থে ইজ্জত-সম্মানের ক্ষেত্রে এইগুলি এমন বাহুল্য বিষয় যার সংরক্ষণ আবশ্যক নহে। কেননা, কোন তিরস্কারকের তিরস্কার, গীবতকারীর গীবত এবং মানুষের অন্তর হইতে ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পাওয়ার আশংকায় যদি আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার বর্জন শুরু হয়, তবে তো শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটির অস্তিত্বই বিলীন হইয়া যাইবে। কেননা, একমাত্র গীবত ব্যতীত অন্য সকল অসৎ কর্মের ক্ষেত্রেই উহার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে 'গীবত' ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হইল, অন্যায় প্রতিরোধকারী যদি ইহা জানিতে পারে যে, আমার নিষেধের কারণে তো সে মানুষের গীবত করা হইতে বিরত হইবেই না, বরং আমার এই বলার কারণে সে হয়ত আমার নামেই আরো অধিক পরিমাণে গীবত করিতে থাকিবে; তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে বাধা দেওয়া হারাম হইবে। কারণ এই ক্ষেত্রে "অন্যায়ের প্রতিরোধ" গোনাহের প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে উহা বৃদ্ধির কারণ হইতেছে। অবশ্য যদি এইরূপ হয় যে, আমার বারণের কারণে সে যেই ব্যক্তির গীবত করিতেছিল সেই ব্যক্তির গীবত করা হইতে নিবৃত হইবে বটে, কিন্তু উহার পরিবর্তে সে আমার গীবত করিতে শুরু করিয়া দিবে– তবে এই ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ ওয়াজিব হওয়ার পরিবর্তে মোস্তাহাব হইবে। কেননা, নিজের ইজ্জতের হেফাজত অপেক্ষা অপরের ইজ্জতের হেফাজত করা অধিক ছাওয়াবের কাজ। পরোপকার ও মানব হিতৈষিতার দাবীও ইহাই।

মোটকথা, শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, ইহতিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব। আর অসৎ কাজ দেখিয়া নীরব থাকা বিপদজনক। তবে ইহ্‌তিসাবের ক্ষেত্রে যদি উপরের বিবরণ অনুযায়ী নিজের জান-মাল ও ইজ্জত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিশ্চিত আশংকা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে উহা হইতে বিরত থাকা যাইবে। কিন্তু নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক উপাদান যেহেতু শরীয়তে কাম্য নহে; সুতরাং উহা বিনষ্ট হওয়ার 'ক্ষতি' অন্যায় দেখিয়াও নীরব থাকার ক্ষতির পরিপূরক হইতে পারে না।

আদেশ-নিষেধের ফলে নিজের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা

এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, অপরের ক্ষতি অপেক্ষা নিজের ক্ষতির কারণেই মানুষ অধিক কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং এই হিসাবে বলা যায়, যেই ব্যক্তিকে অসৎ কাজ হইতে বারণ করা হয় সেই ব্যক্তি যদি সৎ কাজের আদেশদাতার পরিবর্তে তাহার কোন ঘনিষ্ঠজন (যেমন, তাহার মা-বাবা ও সন্তান ইত্যাদি)-কে কষ্ট দেয়, তবে এই ক্ষেত্রে "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" রহিত না হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং উহার নীতিমালা যেহেতু নিজের হকের তুলনায় অপরের হককে অধিক গুরুত্ব দিয়াছে, এই কারণে আদেশ ও নিষেধকারী ব্যক্তি নিজের বেলায় সহনশীল হওয়ার সুযোগ আছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা যেন অপরের হক কোনভাবেই নষ্ট না হয় এবং কোন অবস্থাতেই যেন সে অপরের কষ্টের কারণ না হয়, এই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ অপরের হক নষ্ট করা বা অপরের কষ্টের কারণ হওয়া কোনভাবেই তাহার পক্ষে জায়েজ হইবে না। সুতরাং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিলে যদি তাহার স্বজন ও পরিবারের সদস্যগণ কোনরূপ কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা বর্জন করা কর্তব্য। কেননা, এই ক্ষেত্রে যেন একটি অন্যায় দমন করিতে গিয়া অপর একটি অন্যায়ের জন্ম দেওয়া হইবে। শরীয়তের বিধান হইল, কোন মুসলমানের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমোদন ছাড়া এমন কোন কাজ করা বৈধ নহে, যেই কাজের কারণে সেই ব্যক্তি কোনরূপ অনিষ্ট ও ক্ষতির শিকার হইতে পারে।

সারকথা হইল, এইরূপ যদি আশংকা হয় যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ফলে আমি নিজে হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হইব না, কিন্তু উহার কারণে আমার আপন লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তবে এই ক্ষেত্রে আদেশ-নিষেধ না করা উত্তম। উহার উদাহরণ যেন এইরূপঃ জনৈক ব্যক্তি আল্লাহতে নিবেদিত হইয়া এমনভাবে দুনিয়া ত্যাগ করিল যে, অবশেষে তাহার নিকট পার্থিব বিষয়-সম্পদ বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। অবশ্য তাহার ঘনিষ্ঠ লোকেরা প্রচুর অর্থ-বিত্ত ও বিষয়-সম্পদের মালিক এবং তাহাদের অনেকেই সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে সমাসীন। এখন সেই সংসার ত্যাগী লোকটি বিষয়-সম্পদের অভাবে নিজের কোন ক্ষতির আশংকা করিতেছে না বটে, কিন্তু তাহার আশংকা হইল, আমি যদি বাদশাহকে অসৎ কাজে নিষেধ করি, তবে তিনি আমার উপর সৃষ্ট ক্রোধ আমার আপনজনদের উপরই প্রকাশ করিবেন। উহা এইরূপে যে, তাহাদের বিষয়-সম্পদ ছিনাইয়া লওয়া হইবে, শারীরিকভাবে

নির্যাতন করা হইবে এবং সরকারী পদ হইতে তাহাদিগকে অপসারণ করা হইবে। অর্থাৎ বাদশাহ বিবিধ উপায়ে তাহাদের উপর নির্যাতন করিবেন। তো এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করা উচিত। কেননা, কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ– যেমন কোন অপরাধ দেখিয়া নীরব থাকা নিষেধ। অবশ্য নিজের লোকজনের জান-মাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিশেষ কোন আশংকা যদি না থাকে এবং শুধুমাত্র এইরূপ আশংকা হয় যে, আমার কারণে তাহাদিগকে কেবল ডাঁট-ধমক ও গালমন্দ করা হইবে; তবে এই অবস্থায় "অসৎ কাজে বারণ" করা যাইবে। এই ক্ষেত্রেও ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সেই গালমন্দ খুব যঘন্য কিনা এবং উহার ফলে তাহাদের মানহানী ঘটিয়া তাহারা উদ্বেগজনক মানসিক পীড়ন অনুভব করিবে কিনা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাধা দান ও শক্তি প্রয়োগ

উপরে অন্যায়ের প্রতিরোধ সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হইল, কাহাকেও কোন অন্যায় করিতে দেখিয়া শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা প্রদান করা যাইবে কিনা? মনে করুন, এক ব্যক্তি তাহার হাত-পা কিংবা অন্য কোন অঙ্গ কর্তন করিতেছে। এখন অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, এই ব্যক্তিকে মৌখিক বাধা দিলে তাহাতে কোন কাজ হইবে না। বরং এই কাজ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে তাহার সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। আবার এই লড়াইয়ে তাহার প্রাণহানীও ঘটিতে পারে। তো এই পরিস্থিতিতে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করা যাইবে কিনা? যদি বলা হয়, হাঁ। তবে পাল্টা প্রশ্ন দেখা দিবে, যেই ক্ষেত্রে লোকটির একটি অঙ্গ কর্তন করা সঙ্গত মনে করা হইতেছে না, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে হত্যা করা কেমন করিয়া বৈধ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের জবাব হইল, প্রথমে সেই ব্যক্তিকে নিষেধ করিতে হইবে যেন সে তাহার অঙ্গ কর্তন না করে। যদি এই নিষেধাজ্ঞা সে অমান্য করে, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করা হইবে– যদিও এই শক্তি প্রয়োগ ও লড়াইয়ের ফলে সে প্রাণ হারায়। কারণ, এখানে মূল উদ্দেশ্য লোকটির অঙ্গ বা তাহার প্রাণ রক্ষা করা নহে; বরং মূল উদ্দেশ্য হইল, একটি অন্যায় ও পাপ দমন করা। কিন্তু এই ঘটনায় অন্যায়ের প্রতিরোধের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিহত হওয়া পাপ নহে, বরং পাপ হইল তাহার নিজের অঙ্গ কর্তন করা।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপঃ মনে করুন এক ব্যক্তি জোর পূর্বক কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার উপর আক্রমণ করিল। এখন সেই মুসলমান যদি নিজের সম্পদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেই অন্যায় আক্রমণ পতিহত করে, আর এই উদ্যোগের ফলে আক্রমণকারী প্রাণ হারায়– তবুও এই উদ্যোগ জায়েজ হইবে। এই উদ্যোগে কোন পাপ হইবে না এবং এইরূপও বলা যাইবে না যে, উক্ত মুসলমান নিজের সম্পদ রক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে হত্যা করিয়াছে। বরং এই ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা হইল, কোন মুসলমানের সম্পদ লুণ্ঠন করা পাপ; আর এই পাপ প্রতিরোধ করার পরিণামে যদি লুণ্ঠনকারী প্রাণ হারায় তবে এই হত্যাকাণ্ডে কোন পাপ হইবে না। ইহা বরং পাপ দমন করার একটি উদ্যোগমাত্র। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও কেবল এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া কাহারো উপর আক্রমণ করা জায়েজ হইবে না যে, লোকটি মানুষের দৃষ্টির অন্তরাল হইলেই সে হয়ত নিজের হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবে, সুতরাং তাহাকে পূর্বাহ্নেই হত্যা করিয়া ফেলা ভাল যেন সেই পাপ অনুষ্ঠানের সুযোগই না থাকে। শরীয়তে এইরূপ হত্যাকাণ্ডের অনুমতি নাই। কেননা, ইহা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নহে যে, লোকচক্ষুর অন্তরাল হইলেই সে এইরূপ পাপ করিবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা হইল, কেবল পাপের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়াই কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না।

গোনাহের তিনটি শ্রেণী

প্রকাশ থাকে যে, পাপ ও গোনাহের তিনটি শ্রেণী রহিয়াছে–

প্রথম প্রকার ঃ প্রথম প্রকার গোনাহ হইল এমন যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জাতীয় গোনাহ বা অপরাধের শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া হইবে। এই শাস্তি প্রয়োগ করিবেন শাসনকর্তা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের পক্ষে এই শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নাই।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ দ্বিতীয় প্রকার গোনাহ হইল এমন যাহা বর্তমানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি হয়ত রেশমী কাপড় পরিধান করিয়া আছে বা শরাব পানের উদ্দেশ্যে উহার পাত্র হাতে লইয়া রাখিয়াছে। এইরূপ অপরাধ যে কোনভাবে দমন করা ওয়াজিব। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অপরাধ দমনের পদ্ধতিটি আবার সেই অপরাধের অনুরূপ কিংবা উহা অপেক্ষা যঘন্য হইয়া না পড়ে। এইরূপ অপরাধ সাধারণ মানুষও দমন করিতে পারিবে।

তৃতীয় প্রকার

তৃতীয় প্রকার হইল এমন অপরাধ যাহা এখনো অনুষ্ঠিত হয় নাই, তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন, এক ব্যক্তি হয়ত শরাব পানের আসরের উদ্দেশ্যে একটি রং মহল প্রস্তুত করিতেছে। তো এখানে অপরা· অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা

সন্দেহযুক্ত। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, কোন প্রতিবন্ধকের কারণে অবশেষে সেই অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হইল না। এইরূপ অবস্থায় কেবল মৌখিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাপ হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া যাইবে। অর্থাৎ এই সম্ভাব্য অপরাধের কারণে তাহাকে তিরস্কার করা বা মারধর করার এখতিয়ার সাধারণ মানুষেরও নাই এবং শাসকশ্রেণীরও নাই। অবশ্য লোকটি যদি শরাবের আসর সাজাইয়া সকল কিছু প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং এইভাবে আসর জমাইয়া শরাব পান করায় সে পূর্ব হইতেই অভ্যস্ত হইয়া থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে বারণ করা কর্তব্য। কেননা, ইতিমধ্যেই সে উহার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করিয়া কেবল শরাবের অপেক্ষা করিতেছে এবং যথাসময় উহার আমদানীও প্রায় নিশ্চিত। এমতাবস্থায় মৌখিক বারণ যদি কার্যকর না হয়, তবে মারধর ও বল প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা যাইবে।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপঃ মনে করুন, কতক বখাটে যুবক মহল্লায় অবস্থিত মহিলাদের গোসলখানার আশেপাশে জটলা বাঁধিয়া সেখানে মহিলাদের প্রবেশ ও বহির্গমন দেখিতেছে। অবশ্য তাহারা মহিলাদের পথরোধ কিংবা তাহাদিগকে কোনরূপ উত্যক্ত করে না বটে। এখন কোন ব্যক্তি যদি যুবকদিগকে তথায় দাঁড়াইতে নিষেধ করে এবং এই বিষয়ে কঠোরতাও আরোপ করে তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। কেননা, যুবকরা এমন স্থানে দাঁড়াইয়াছে, যেখানে দাঁড়ানোই অপরাধ– যদিও তাহাদের মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন, কোন বেগানা নারীর সঙ্গে একান্তে অবস্থান পাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কারণেই তাহা পাপ। "পাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা" দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন কর্ম যাহা দ্বারা পাপ অনুষ্ঠানের সুযোগ হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধকে "সম্ভাব্য পাপের প্রতিরোধ" বলা যাইবে না। বরং ইহা যথার্থই উপস্থিত পাপের প্রতিরোধ।

ইহ্‌তিসাবের দ্বিতীয় পর্যায়

উপরোক্ত সুদীর্ঘ আলোচনায় আমরা আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের প্রথম পর্যায়ের শর্তসমূহ এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা উহার দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্তসমূহ আলোচনা করিব। এই শর্ত সমূহের মধ্যে রহিয়াছে– (১) যেই কর্মটিকে নিষেধ করা হইবে তাহা গর্হিত হওয়া (২) গর্হিত কর্মটি উপস্থিত বিদ্যমান হওয়া (৩) গর্হিত কর্মটি কোনরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই প্রকাশ হওয়া (৪) কোনরূপ ইজতিহাদ ছাড়াই ইহা জানা যে, কর্মটি গর্হিত। নিম্নে আমরা পৃথক পৃথকভাবে উহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

প্রথম শর্তঃ কর্মটি গর্হিত হওয়া

প্রথম শর্ত হইতেছে সেই কর্মটি গর্হিত হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তে তাহা নিষিদ্ধ হওয়া। এখানে আমরা গোনাহ শব্দের পরিবর্তে 'গর্হিত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। কেননা, গর্হিত শব্দটি গোনাহ অপেক্ষা ব্যাপক। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কোন বালক বা উম্মাদকে শরাব পান করিতে দেখে, তবে উহাতে বাধা দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। অথচ বালক ও উম্মাদের পক্ষে শরাব পান করা গোনাহ নহে। অর্থাৎ বালক ও উন্মাদের উপর যেহেতু শরীয়তের কোন বিধিবিধান কার্যকর নহে, এই কারণে শরাব পান তাহাদের জন্য গোনাহ নহে বটে, কিন্তু তাহা গর্হিত হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তো গোনাহ শব্দের পরিবর্তে গর্হিত শব্দটি আমরা এই কারণে ব্যবহার করিয়াছি যে, এই শব্দটি যাবতীয় অন্যায়-অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে। মনে করুন, আমরা যদি গোনাহ শব্দটি ব্যবহার করিতাম, তবে বালক ও উম্মাদের শরাব পানের ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করা যাইত না। কেননা, তাহাদের জন্য তো উহা পান করা গোনাহ নহে। আর গর্হিত শব্দটি এমনই ব্যাপক যে, উহা কবীরা ও ছগীরা উভয় গোনাহের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হইতে পারে। অন্যায়ের প্রতিরোধ তো কেবল কবীরা গোনাহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং কোথাও ছগীরা গোনাহ হইতে দেখিলেও বাধা দেওয়া ওয়াজিব। যেমন– গোসলখানায় উলঙ্গ হওয়া, বেগানা নারীর সঙ্গে একান্তে অবস্থান করা এবং তাহাদের দিকে তাকানো এইসবই ছগীরা গোনাহ। কিন্তু তবুও উহাতে বারণ করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় শর্তঃ গর্হিত কর্মটি বর্তমানে বিদ্যমান হওয়া

দ্বিতীয় শর্ত হইল, গর্হিত কর্মটি আপাতত বিদ্যমান হওয়া। অর্থাৎ যাহা

অতীত হইয়া গিয়াছে কিংবা ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে– এমন গর্হিত কর্মের জন্য বারণ করা যাইবে না। যেমন এক ব্যক্তি শরাব পান সম্পন্ন করিয়াছে। এখন এই অপরাধের জন্য তাহাকে যেকেহ তিরস্কার করিতে পরিবে না। কেননা, এই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের একটি হুকুম অমান্য করিয়াছে। সুতরাং এই অপরাধের জন্য আল্লাহ পাক যেই শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, শাসনকর্তার পক্ষ হইতে তাহা প্রয়োগ করা হইবে। অর্থাৎ এই বিষয়ে যেকেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অনুরূপভাবে সম্ভাব্য অপরাধের উদাহরণ হইলঃ মনে করুন, কোন লক্ষণ দ্বারা জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব পান করিবে। এখন এই ক্ষেত্রে তো এই সম্ভাবনাও আছে যে, কোন প্রতিবন্ধকের কারণে সে হয়ত শরাব পান করিবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় কেবল মৌখিকভাবে তাহাকে উপদেশ দেওয়া যাইবে। আর ইহাও কেবল তখনই করা যাইবে যখন সে তাহার ইচ্ছার কথা অস্বীকার না করিবে। অর্থাৎ সে যদি অস্বীকার করিয়া বলে যে, "আমি শরাব পান করিব না" তখন তাহাকে মৌখিকভাবেও উপদেশ দেওয়ার অনুমতি নাই। কেননা, এইরূপ করিলে একজন মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা হইবে।

তৃতীয় শর্তঃ গর্হিত কর্মটি কোনরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই প্রকাশ হওয়া

তৃতীয় শর্ত হইতেছে, গর্হিত কর্মটি কোনরূপ অনুসন্ধান ও খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নিষেধকারীর নিকট প্রকাশ হওয়া। সে মতে কোন ব্যক্তি যদি ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া কোন অপরাধ করে, তবে উহা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তৎপর হওয়া জায়েজ নহে। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষের দোষ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে নিষেধ করিয়াছেন।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির বাড়ীর দেয়ালে উঠিয়া তাহার ঘরের ভিতর দৃষ্টি দিলেন। বাড়ীর মালিক তখন ঘরের ভিতর কোন অন্যায় কর্মে লিপ্ত ছিল। তিনি লোকটিকে এই বিষয়ে বারণ করিলে সে আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আল্লাহ পাকের একটি নাফরমানী করিতেছি আর আপনি একই সঙ্গে আল্লাহর তিনটি হুকুম অমান্য করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ পাকের সেই তিনটি হুকুম কি? লোকটি আরজ করিল, আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

وَلَا تَجَسَّسُوْا

অর্থঃ "এবং গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করিও না।" (সূরা হুজুরাতঃ আয়াত ১২)

অথচ আপনি গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে আমার দোষ তালাশ করিতেছেন। আল্লাহ পাকের দ্বিতীয় হুকুম হইল–

وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

অর্থঃ "আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়া।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৮৯)

অথচ আপনি দেয়ালের উপর দিয়া তাশরীফ আনিয়াছেন। আপনার কর্তব্য ছিল যথারীতি দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করা। আল্লাহ পাকের তৃতীয় হুকুম হইল–

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

অর্থঃ "তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কোন গৃহে প্রবেশ করিও না, যেই পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদিগকে ছালাম না কর।" (সূরা নূরঃ আয়াত ২৭)

অথচ আপনি না ছালাম করিয়াছেন, না ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছেন। এই কথা শুনিবার পর হযরত ওমর (রাঃ) গৃহবাসীকে আর কিছুই বলিলেন না এবং সে এই অপরাধ হইতে তওবা করিয়া লইবে– এই ওয়াদার উপর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার মিম্বরে দাঁড়াইয়া ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শাসনকর্তা যদি নিজ চোখে কোন অপরাধ দেখে, তবে কি তিনি অপর কোন সাক্ষী ব্যতীতই হদ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করিতে পারিবেন? হযরত আলী (রাঃ) ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, হদ্ কায়েমের জন্য শাসনকর্তার একক প্রত্যক্ষ যথেষ্ট নহে। বরং এই ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষী আবশ্যক হইবে।

গর্হিত কর্ম প্রকাশ্য ও গোপন হওয়ার সংজ্ঞা

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গর্হিত কর্ম প্রকাশ্য ও গোপন হওয়ার সংজ্ঞা কি? উহার জবাব হইল কোন ব্যক্তি যদি দেয়ালের আড়ালে বা ঘরের ভিতরে চলিয়া যায়, তবে কেবল তাহার অপরাধ জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিনা অনুমতিতে তাহার ঘরে প্রবেশ করা নিষেধ। কিন্তু বাহির হইতে যদি জানা যায় যে, ঘরের ভিতরে কোন পাপ কর্ম হইতেছে; যেমন বাহির হইতে যদি ঘরের ভিতরের বাঁশির আওয়াজ বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনা যায় কিংবা তাহাদের কথাবার্তা দ্বারা ইহা নিশ্চিত বুঝা যায় যে, ঘরের ভিতর তাহারা শরাব পান করিতেছে, তবে এই ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে ভিতরে

প্রবেশ করিয়া ঐসব জিনিস নষ্ট করিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে।

আওয়াজ ও শব্দ দ্বারা যেমন গর্হিত কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্রূপ গন্ধ দ্বারাও উহা টের পাওয়া যায়। যেমন শরাবের গন্ধ দ্বারাও ঘরের বাহির হইতে উহার উপস্থিতি অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, ইহা গৃহে রক্ষিত শরাবের গন্ধ এবং এখন উহা পান করা হইতেছে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করা এবং শরাব ফেলিয়া দেওয়ার অনুমতি নাই। পক্ষান্তরে ঘরের বাহির হইতে অনুভূত শরাবের গন্ধ এবং আনুসঙ্গিক অন্য কোন লক্ষণ দ্বারা যদি ইহা অনুভব করা যায় যে, ইহা রক্ষিত শরাবের গন্ধ নহে, বরং ঘরের লোকেরা এখন উহা পান করিতেছে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া উহা ফেলিয়া দেওয়া যাইবে।

অনেক সময় মানুষের দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশ্যে জামা বা আস্তিনের ভিতর শরাবের বোতল বা অন্য কোন অবৈধ ও গর্হিত দ্রব্য লুকাইয়া রাখা হয়। পথে যদি কোন ফাসেক ব্যক্তিকে এইরূপ করিতে দেখা যায়, তবে যতক্ষণ না কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উহার অবৈধতা নিশ্চিত হওয়া যাইবে, ততক্ষণ উহা খুলিয়া দেখা জায়েজ নহে। কেননা, কোন ব্যক্তি ফাসেক ও পাপী হইলেই ইহা জরুরী নহে যে, সে জামার ভিতর বা আস্তিনের ভিতর যাহাকিছু লুকাইয়া লইয়া যাইবে, উহাই অবৈধ দ্রব্য হইবে। কারণ, ফাসেকের পক্ষে তো কোন সঙ্গত কারণেও সিরকা বা শরবতের বোতল লুকাইয়া লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

মোটকথা, যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কাপড়ের নীচে শরাবের বোতল আছে, তবে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে। কিন্তু তাহাকেও এই কথা বলা যাইবে না যে, তোমার বোতলটি বাহির কর, আমি দেখিব উহাতে শরাব আছে কিনা? কেননা, এইরূপ করিলে তাহা "গুপ্ত বিষয় অনুসন্ধান" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে- যাহা নিষিদ্ধ।

চতুর্থ শর্তঃ ইজতিহাদ ছাড়াই গর্হিত বিষয় অবগত হওয়া

চতুর্থ শর্ত হইল, কোনরূপ ইজতিহাদ ছাড়াই ইহা অবগত হওয়া যে, বিষয়টি অনিষ্টকর ও গর্হিত। সুতরাং কোন বিষয় যদি ইজতিহাদ নির্ভর হয়, অর্থাৎ বিষয়টি গর্হিত কিনা এই বিষয়ে যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নিষেধ করা যাইবে না। যেমন, হানাফী মাজহাবের অনুসারীর পক্ষে ইহা জায়েজ নহে যে, সে কোন শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীকে এমন প্রাণীর গোশত খাইতে নিষেধ করিবে যাহা 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া জবাই করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীর পক্ষে ইহা জায়েজ নহে যে, সে কোন হানাফীকে 'নাবীজ' (যাহাতে নেশা নাই) পান করিতে বারণ করিবে। কারণ, এইগুলি ইজতিহাদী বিষয়।

ইহ্‌তিসাবের তৃতীয় রোকন

ইহ্‌তিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের তৃতীয় রোকন হইল মুহতাসিব আলাইহি (যাহার উপর আদেশ-নিষেধ করা হয়)। মুহ্‌তাসিব আলাইহির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা শর্ত যেন নিষিদ্ধ কর্মটি তাহার জন্য গর্হিত হইতে পারে। অর্থাৎ তাহার মানুষ হওয়া শর্ত, কিন্তু মুকাল্লাফ হওয়া শর্ত নহে। মুকাল্লাফ বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যাহার উপর শরীয়তের বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইতে পারে। এই নীতিমালার আলোকেই ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি, কোন বালক শরাব পান করিলে তাহাকেও নিষেধ করা হইবে। অথচ এখনো সে বালেগ হয় নাই এবং নাবালেগ হওয়ার কারণে সে মুকাল্লাফ নহে।

অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তির উপর আদেশ-নিষেধ করা হইবে তাহার মধ্যে ভালমন্দ যাচাই করার শক্তি থাকাও শর্ত নহে। সেমতে কোন উন্মাদ ব্যক্তি যদি কোন উম্মাদ নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাকে নিষেধ করা হইবে। অথচ উন্মাদের মধ্যে ভালমন্দ যাচাই করার কোন যোগ্যতা নাই। অবশ্য কোন কোন কর্ম এমন আছে যাহা উন্মাদের জন্য যথার্থ গর্হিত নহে। যেমন, নামাজ-রোজা তরক করা ইত্যাদি।

প্রাণী হওয়ার শর্ত না লাগাইবার কারণ

উপরের আলোচনার আলোকে এখানে বলা যাইতে পারে যে, মুহতাসিব আলাইহি বা যাহার উপর আদেশ-নিষেধ করা হইবে সে "মানুষ হইতে হইবে" এমন শর্তের পরিবর্তে যদি বলা হইত, সে "প্রাণী হইতে হইবে" তবে ভাল হইত। কেননা, উহার ফলে কোন গরু-ছাগল কাহারো খেত নষ্ট করিতে লাগিলে আমরা উহাতে বাধা দিতে পারিতাম- যেমন উন্মাদ ব্যক্তিকে ব্যভিচার করিতে দেখিলে তাহাকে নিষেধ করা হয়। এই বক্তব্যের জবাবে আমরা বলিব- বস্তুতঃ কোন জীব-জানোয়ারকে বাধা দেওয়ার নাম "অন্যায়ের প্রতিরোধ" হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ নাই। কেননা, আল্লাহর হকের কারণে কোন গর্হিত কর্মে বাধা দেওয়ার নামই হইল ইহ্‌তিসাব। এই ইহ্‌তিসাবের দাবী হইল, যাহাকে বাধা দেওয়া হইবে সে যেন সেই গর্হিত কর্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। বিষয়টাকে ভালভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন- হক্কুল্লাহর

কারণেই উন্মাদকে ব্যভিচার হইতে এবং বালককে শরাব পান করা হইতে নিষেধ করা হয়। কেননা, নীতিগতভাবে ব্যভিচার ও মদ্য পান হারাম, আর এখানে আল্লাহর সেই হুকুম লংঘিত হইতেছে। অর্থাৎ এখানে শুধুই আল্লাহর হক নষ্ট হইতেছে। কিন্তু কোন মানুষ যদি অপর কাহারো ফসল নষ্ট করে তবে এই ক্ষেত্রে বান্দার হক এবং আল্লাহর হক– এই উভয় প্রকার হকই নষ্ট করা হইবে। সংশ্লিষ্ট বান্দার হক হইল, সে ঐ ফসলের মালিক এবং তাহার মালিকানাধীন সম্পদ নষ্ট করা হইতেছে। আর আল্লাহর হক হইল, এখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করিয়া একটি পাপ করা হইতেছে। অর্থাৎ এখানে দুইটি হক এবং দুইটি ত্রুটি। একটি ত্রুটি অপরটি হইতে পৃথক। এই কারণেই কোন ব্যক্তি যদি কাহারো অনুমতি সাপেক্ষে তাহার হস্ত কর্তন করে, তবে এই ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর হুকুম অমান্য হওয়ার কারণে নিষেধ করা হইবে। কিন্তু হাতের মালিক যেহেতু উহা কর্তন করার অনুমতি দিয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার হক বিলুপ্ত হইবে।

এইবার বিষয়টাকে আরো সহজভাবে উপলব্ধি করুন। জীব-জানোয়ার যদি কাহারো কিছু নষ্ট করে, তবে উহাতে কোন পাপ হইবে না। কিন্তু বর্ণিত দুইটি ত্রুটির একটি বিদ্যমান হওয়ার কারণে জীব-জানোয়ারকেও বাধা দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ জীব-জানোয়ারকে শস্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ সেই জানোয়ারকে নিষেধ করা নহে; বরং এখানে নেহী আনিল মুনকারের উদ্দেশ্য একজন মুসলমানের সম্পদ হেফাজত করা। যদি জানোয়ারকে নিষেধ করাই লক্ষ হইত তবে তো উহাকে মুরদার খাইতে দেখিলে কিংবা শরাবের পাত্রে মুখ দিতে দেখিলেও নিষেধ করা হইত। কেননা, এইসব কর্মও গর্হিত। অথচ শিকারী কুকুরকে মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ানো জায়েয।

মোটকথা, এখানে মূল লক্ষ্য হইতেছে মুসলমানের মালের হেফাজত করা। সুতরাং আমাদের পক্ষে যদি বিনা ক্লেশে অপর কাহারো সম্পদের হেফাজত সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই তাহা করিতে হইবে। মনে করুন, উপর হইতে কাহারো একটি মটকা পতিত হইতেছে এবং উহার বরাবর নীচে অপর কাহারো একটি বোতল রক্ষিত আছে। বোতলের উপর মটকা পতিত হইলে বোতলটি চূর্ণ হইয়া যাওয়া নিশ্চিত। এখন বোতলটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মটকার পতন বাধা দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই বাধা প্রদানের উদ্দেশ্য বোতলের হেফাজত; মটকার পতন প্রতিরোধ নহে।

অনুরূপভাবে উন্মাদকে জানোয়ারের সঙ্গে ব্যভিচার করা এবং অপ্রাপ্ত বালককে শরাব পান করা হইতে বাধা দানের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য জানোয়ারকে রক্ষা করা কিংবা শরাবের হেফাজত নহে; বরং এই ক্ষেত্রে

আমাদের উদ্দেশ্য হইবে উন্মাদ ও বালকের হেফাজত। কেননা, এই উন্মাদ ও বালক হইল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ইনসান– যাহারা সম্মানের পাত্র। আসলে এইসব বিষয় এমনই জটিল ও সূক্ষ্ম যে, সকলের পক্ষে উহার মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন বটে। ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী ও মোহাক্কেক ব্যক্তিগণই কেবল এইসবের হাকীকত যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। অবশ্য সাধারণ মানুষের পক্ষেও এইসব বিষয়ে গাফেল থাকা উচিৎ নহে।

মুসলমানের সম্পদের হেফাজত

সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকিলে মুসলমানের সম্পদের হেফাজত করা কর্তব্য। এখন প্রশ্ন হইল, কোন মুসলমানের ক্ষেতে হয়ত কোন পশু ঢুকিয়া তাহার ফসল নষ্ট করিতেছে। এখন সেই পশুকে ক্ষেত হইতে তাড়াইয়া দেওয়া দর্শকের উপর ওয়াজিব কিনা? অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ নষ্ট হইতে দেখিলে দর্শকের যদি উহা রক্ষা করার ক্ষমতা থাকে, তবে সেই মুসলমান ভ্রাতার সম্পদ রক্ষা করা তাহার কর্তব্য কিনা? যদি বলা হয়, অবশ্যই তাহা রক্ষা করিতে হইবে; তবে তো মানুষকে জীবন ব্যাপী অপর মুসলমানের উপকারেই ব্যপৃত থাকিতে হইবে। কেননা, এইরূপ অবস্থা তো তাহাকে হরহামেশাই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যদি বলা হয়– মুসলমানের সম্পদ হেফাজত করা ওয়াজিব নহে, তাহা হইলে আমরা বলিব, তবে তো সেই ব্যক্তিকেও নিষেধ না করা উচিৎ, যে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করিতেছে। কেননা, অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করার মধ্যে যেমন মুসলমানের সম্পদের হেফাজত বিদ্যমান; তদ্রূপ লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠনে বাঁধা দেওয়ার মধ্যেও তাহা বিদ্যমান। আসলে ইহা একটি জটিল প্রসঙ্গ বটে। এই বিষয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল– কোন ব্যক্তি যদি নিজের শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও নিজের মান-সম্মান বজায় রাখিয়া অপরের সম্পদ হেফাজত করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে মুসলমান ভাইয়ের সম্পদের হেফাজত করা কর্তব্য। এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অসংখ্য হক রহিয়াছে। শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া মুসলমানের সম্পদের হেফাজত করা– সেইসব হকের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

মোটকথা, কোনরূপ ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি না হইলে এক মুসলমান অপর মুসলমানের সম্পদের হেফাজত করিবে। ইহা মুসলমানের হক এবং এই হক আদায় করা ওয়াজিব। আমাদের দৃষ্টিতে এই ওয়াজিব ছালামের জবাব দানের ওয়াজিব অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ছালামের জবাব না দিলে এই পরিমাণ কষ্ট হয় না– যেই পরিমাণ কষ্ট হয় সম্পদের হেফাজত না করিলে। আলেমগণ এইরূপও বলিয়াছেন যে, কাহারো সম্পদ ছিনাইয়া লওয়ার পর কোন ব্যক্তির নিকট যদি ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, যাহা

দ্বারা ঐ সম্পদ ফেরৎ পাওয়া যাইতে পারে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। না দিলে গোনাহগার হইবে। অর্থাৎ প্রয়োজনে সাক্ষ্য দেওয়া যেমন জরুরী, তদ্রূপ সম্পদের হেফাজত করাও জরুরী। তবে শর্ত হইল, সাক্ষ্যদাতা ও সম্পদের হেফাজতকারীর যেন কোনরূপ আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ অপরের জন্য সাক্ষ্য প্রদান বা অপরের সম্পদের হেফাজত করিতে গিয়া যদি নিজের জান-মাল বা সম্মানের ক্ষতিসাধনের আশংকা দেখা দেয় তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সেই ওয়াজিব রহিত হইয়া যায়। কেননা, অপরের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন জরুরী, তদ্রূপ নিজের জান-মালের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণও জরুরী। অপরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে বলা হয় নাই। অবশ্য নিজের স্বার্থের উপর অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া যাইবে। অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া মোস্তাহাব। আর মুসলমানের জন্য কষ্ট বরদাশত করা এবাদত। সুতরাং কোন পশুকে খেত হইতে বাহির করা যদিকষ্ট কর হয়, তবে এই ক্ষেত্রে উহাকে ক্ষেত হইতে বাহির করার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করা জরুরী নহে। তবে খেতের মালিককে এই বিষয়ে অবগত করা যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাতে অবহেলা করা উচিৎ হইবে না। কেননা, ইহাতে কোনরূপ কষ্ট হওয়ার কথা নহে। অর্থাৎ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খেতের মালিককে এই বিষয়ে অবহিত না করা এবং সে ঘুমাইয়া থাকিলে তাহাকে জাগ্রত না করা– কাজীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান না করার সমান অপরাধ।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে এইরূপ বলা ঠিক হইবে না যে, "এই ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া একটি দিককে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। উদাহরণতঃ যেই ব্যক্তি খেত হইতে পশু তাড়াইবে, তাহার এক দেরহাম ক্ষতি হইবে, পক্ষান্তরে খেত হইতে পশু না তাড়াইলে খেতের মালিকের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে পশু তাড়ানোকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।"

উপরোক্ত প্রসঙ্গে আমরা বলিব, খেতের মালিকের যেমন হাজার হাজার দেরহামের ফসল রক্ষা করার হক আছে; তদ্রূপ সেই ব্যক্তিরও তাহার এক দেরহাম রক্ষা করার হক আছে। সুতরাং এই কথা বলিবার কোন সুযোগ নাই যে, যাহার ক্ষতির পরিমাণ বেশী, তাহার দিকটিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

পতিত বস্তু হেফাজত করা

পতিত বস্তু উদ্ধার ও হেফাজত করার বিষয়টি আমাদের বক্ষমান আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এই বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি, তাহাও এখানে আলোচনা করা হইবে।

এমন পতিত বস্তু যাহা উদ্ধার না করিলে নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশংকা বিদ্যমান, আর তাহা উদ্ধার করিলে "মুসলমানের সম্পদ হেফাজত" হওয়া নিশ্চিত– এমতাবস্থায় সেই বস্তু উদ্ধার করিয়া হেফাজত করা কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হইল– বস্তুটি যদি এমন জায়গায় পড়িয়া থাকে যে, তথা হইতে উহা উদ্ধার না করিলে বিনষ্ট হওয়া বা মালিকের নিকট না পৌছাইবার আশংকা নাই; তবে এই ক্ষেত্রে তাহা উদ্ধার করা জরুরী নহে। যেমন, বস্তুটি হয়ত কোন মসজিদ বা মুসাফির খানায় পড়িয়া আছে এবং তথাকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ঈমানদার ও বিশ্বস্ত।

অবশ্য পতিত বস্তুটি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকিলে সেই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, উহা উদ্ধার ও হেফাজত করিতে কোনরূপ কষ্ট ও পেরেশানী হইবে কিনা? যদি কষ্টকর হয়, যেমন পতিত বস্তুটি হয়ত কোন প্রাণী যাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়া নেহায়েতই কষ্টকর এবং উদ্ধার-পরবর্তী উহার দানাপানির আয়োজন ও রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি আরো কষ্টকর। এইরূপ ক্ষেত্রেও উহা উদ্ধার ও হেফাজত করা জরুরী নহে। কেননা, পতিত বস্তুটির মালিকের হকের কারণেই উহা উদ্ধার করা জরুরী হয়। তাহার হকের প্রতি এই কারণে লক্ষ্য করা হয় যে, সে একজন ইনসান এবং ইনসান হইল সম্মানের পাত্র। কিন্তু এই ইনসান হওয়ার বৈশিষ্ট্য এককভাবে কেবল মালিকের জন্যই সংরক্ষিত নহে। বরং উদ্ধারকারী ব্যক্তিও এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুতরাং মালিকের যেমন এই হক আছে যে, তাহার সম্পদ যেন হেফাজত করা হয়, তদ্রূপ উদ্ধারকারীরও এই হক আছে যে, অপরের সম্পদ হেফাজত করিতে গিয়া যেন তাহাকে কষ্টের শিকার হইতে না হয়।

এমন পতিত বস্তু যাহা উদ্ধার করিলে উহার হেফাজত এবং মালিকের জন্য এক বৎসর অপেক্ষা এবং উহার জন্য এলান করা ব্যতীত অন্য কোন কষ্ট নাই– তাহা কুড়াইয়া আনা যাইবে কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। যেমন পতিত বস্তুটি হয়ত মুদ্রা, স্বর্ণ বা মূল্যবান কাপড়। অর্থাৎ এই সব বস্তু হেফাজতের জন্য বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হয় না। কেহ কেহ বলেন, দীর্ঘ এক বৎসর পতিত বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে এলান করা এবং যথা বিহিত এই আমানতের হেফাজত ইত্যাদিও কম কষ্টকর নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও পতিত বস্তুটি উদ্ধার করা আবশ্যক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কেহ যদি এইসব ঝামেলা বরদাশত করিতে পারে এবং ছাওয়াবের নিয়তে তাহা কুড়াইয়া আনে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হকের কথা চিন্তা করিলে এই কষ্ট কোন কষ্টই নহে।

ইহা যেন কাজীর আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দেওয়ার কষ্ট স্বীকার করার মতই

একটি মামুলী কষ্ট। অবশ্য কাজীর আদালত যদি অন্য কোন শহরে হয়, তবে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সফরের কষ্ট স্বীকার করা জরুরী নহে। তবে কেহ যদি অপরের উপকারার্থে স্বেচ্ছায় এই কষ্ট স্বীকার করে তবে তাহা ভিন্ন কথা। আর কাজীর আদালত যদি নিকটেই হয়, তবে এই ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদানে অবহেলা করা উচিত নহে।

কিন্তু এখানে একটি তৃতীয় অবস্থা হইল, কাজীর আদালত যদি শহরের অপর প্রান্তে অবস্থিত হয় এবং দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমের সময় তথায় গমন করা যদি কষ্টকর হয়, তবে এই ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ? বস্তুতঃ এই বিষয়ে নিজের ইজতিহাদ ও গভীর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, মুসলমানের হক আদায়ের ক্ষেত্রে যেই কষ্ট হয়, তাহা ক্ষেত্র বিশেষ কম হয় আবার বেশীও হয়। এই দুই অবস্থার হুকুম কি তাহা পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মধ্যম অবস্থাটি অত্যন্ত নাজুক ও সংশয়পূর্ণ। ইহা এমন এক জটিল সমস্যা যে, মানুষের পক্ষে ইহার সমাধান দুরূহ বটে। কেননা, এই ক্ষেত্রে আমরা এমন কোন পদ্ধতি ও বিধানের সন্ধান পাই নাই যাহা দ্বারা এই মধ্যম পদ্ধতিটির সঠিক অবস্থান নিরূপনপূর্বক উহাকে কম কষ্টের বা বেশী কষ্টের দিকে যুক্ত করা যাইবে। এই কারণেই আহলে তাকওয়া ও পরহেজগার ব্যক্তিগণ এই জাতীয় নাজুক অবস্থায় নিজেদের ব্যাপারে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং কোনরূপ সংশয় ও সন্দেহজনক অবস্থায় সংশ্লিষ্ট না হইয়া বরং নিশ্চিত অবস্থার উপর আমল করেন।

চতুর্থ রোকন ঃ ইহ্তিসাব

ইহ্তিসাব তথা "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" কয়েকটি স্তরে বিভক্ত এবং উহার কতক আদব রহিয়াছে। নিম্নে আমরা ইহ্তিসাবের স্তর এবং উহার আদবসমূহের উপর পৃথক শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ইহ্তিসাবের প্রথম স্তরঃ তা'রীফ

ইহ্তিসাবের প্রথম স্তর হইল তা'রীফ। অর্থাৎ গর্হিত কর্ম খুঁজিয়া বেড়ানো এবং এমন আলামত ও লক্ষণ অনুসন্ধান করা যেন উহা দ্বারা মুনকার তথা গর্হিত কর্মটি প্রমাণ করা যায়। বস্তুতঃ ইহা গুপ্তচরবৃত্তি এবং শরীয়তে ইহা নিষিদ্ধ। সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে শোভনীয় নহে–

০ কাহারো ঘরের দেয়ালে কান পাতিয়া ভিতরের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনিতে চেষ্টা করা।

০ পথ চলার সময় জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করা এবং কোন ঘর হইতে শরাবের গন্ধ আসিতেছে কি না তাহা মালুম করার চেষ্টা করা।

০ কাহারো জামার নীচে বা আস্তিনের ভিতর রক্ষিত দ্রব্যের উপর হাত রাখিয়া জানিতে চেষ্টা করা যে, ইহা কোন অবৈধ দ্রব্য বা শরাবের বোতল কি-না।

০ মানুষের চরিত্র ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাহার প্রতিবেশীর নিকট জিজ্ঞাসা করা– ইত্যাদি।

অবশ্য দুইজন সত্যবাদী ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত নিজেরাই আসিয়া বলে যে, অমুক ব্যক্তির ঘরে শরাব আছে এবং সে উহা পান করিতেছে, তবে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিনা অনুমতিতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া উহাতে বাধা দেওয়া যাইবে। অন্যায় কর্মে বাধা দানের উদ্দেশ্যে গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করা যেন অন্যায় কর্মের জন্য কাহাকেও প্রহার করার মত।

সংবাদদাতা যদি একজন সত্যবাদী ও দুইজন গোলাম হয় কিংবা এমন কতক লোক হয় যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না, তবে তাহাদের সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কাহারো ঘরে প্রবেশ করা ঠিক হইবে না। কেননা, গৃহকর্তার এই হক স্বীকৃত যে, তাহার অনুমতি ছাড়া যেন কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ না করে। আর কোন মুসলমানের হক প্রমাণিত হওয়ার পর যতক্ষণ না দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, ততক্ষণ তাহার এই হক বলবৎ থাকিবে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ গর্হিত কর্মটি জানাইয়া দেওয়া

অনেক সময় অজ্ঞতার কারণেও অন্যায় ও গর্হিত কাজ করা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহা জানা নাই যে, সে যাহা করিতেছে শরীয়তে তাহা নিষিদ্ধ। যদি জানা থাকিত, তবে কস্মিনকালেও সে এইরূপ করিত না। যেমন অনেক গ্রাম্য লোক নিয়মিত নামাজ পড়ে বটে কিন্তু অজ্ঞতার কারণেই তাহারা রুকু-সেজদাগুলি ঠিকমত আদায় করে না। অবশ্য এই শ্রেণীটি সম্পর্কে এইরূপ বলা যাইবে না যে, তাহারা নামাজের ব্যাপারে যত্নবান নহে। কেননা, যদি এইরূপই হইত তবে তো উহার জন্য তাহারা অজু, তাহারাত ইত্যাদির কষ্ট স্বীকার করিয়া জামাতে আসিয়া হাজির হইত না। আসলে এই গ্রাম্য লোকেরা একেবারেই সাধাসিধা ও সরল। দ্বীনের এলেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তাহারা সঠিক মাসআলার উপর আমল করিতে পারিতেছে না। এই শ্রেণীর মানুষকে নরম ভাষায় শরীয়তের বিধান জানাইয়া দিতে হইবে। নরম ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে এই কারণে যে, কাহাকেও কোন মাসআলা বলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল, প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে তাহাকে অজ্ঞ ও মূর্খ প্রমাণিত করা। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে অপমানবোধ করা খুবই

স্বাভাবিক। কেননা, এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাইবে, যে নিজের প্রতি মূর্খতার অভিযোগ স্বাভাবিকভাবে মানিয়া লইবে। বিশেষতঃ ধর্মীয় বিষয়ে মূর্খতার অভিযোগ উঠিলে মানুষের নিকট তাহা নেহায়েতই অসহনীয় মনে হয়। এই কারণেই কোন মানুষকে যখন শরীয়তের বিধান অবহিত করিয়া গর্হিত পন্থা পরিহার পূর্বক সঠিক মাসআলার উপর আমল করিতে বলা হয়, তখন সে উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং জানিয়া শুনিয়াই হক ও সত্য বিষয় অস্বীকার করিয়া বসে, যেন তাহার মূর্খতা সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে। স্বভাবগতভাবে মানুষ যেন নিজের সতর ঢাকা অপেক্ষা মূর্খতার আয়েব (ত্রুটি) ঢাকিয়া রাখিতে অধিক তৎপর হয়। কারণ মূর্খতা হইল নফসের ত্রুটি আর সতর খোলা থাকা দেহের ত্রুটি। এ দিকে নফস দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই কারণে নফসের ত্রুটিও অধিক যঘন্য। এতদ্ব্যতীত দেহের ত্রুটির কারণে দেহের উপর কোন তিরস্কার করা হয় না। কারণ, দেহ হইল আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলে না উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে, না উহাকে ত্রুটিযুক্ত করিতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষ ইচ্ছা করিলেই মূর্খতার অভিশাপ দূর করিয়া নিজের নফসকে এলেমের অলংকার দ্বারা সজ্জিত করিতে পারে। এই কারণেই মানুষকে তাহার মূর্খতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে কষ্ট অনুভব করে। পক্ষান্তরে তাহার এলেমের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে পুলকিত হয় এবং অপরের উপর তাহার এলেমের তাছীর অনুভব করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

সারকথা হইল, কোন মানুষকে তাহার মূর্খতা সম্পর্কে জ্ঞাত করা যেহেতু তাহার জন্য কষ্টের কারণ হয়, এই কারণে মুহতাসিব তথা আদেশ-নিষেধকারীর কর্তব্য, বিনয় ও বিনম্র আচরণের মাধ্যমে তাহাদের মূর্খতা দূর করার চেষ্টা করা। যেমন গ্রামের মূর্খ লোকদিগকে এইভাবে বলা যাইতে পারেঃ দেখুন, কোন মানুষই মায়ের উদর হইতে লেখাপড়া শিখিয়া জন্মগ্রহণ করে না। আমি নিজেও ইতিপূর্বে নামাজের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। পরে আলেমদের নিকট হইতে তাহা শিখিয়া লইয়াছি। সম্ভবতঃ আপনাদের গ্রামে কোন আলেম নাই, কিংবা থাকিলেও তিনি হয়ত আপনাকে সঠিক মাসআলা বলিয়া দিতে পারেন নাই। আর এই কারণেই হয়ত আপনি রুকু-সেজদায় ত্রুটি করিতেছেন। অথচ নামাজের শর্ত হইল, রুকু-সেজদাগুলি ঠিক ঠিক মত আদায় করিতে হইবে।

মোটকথা, এই ক্ষেত্রে কোনরূপ কঠোরতা আরোপ না করিয়া নম্রতার সহিত তাহাকে বুঝাইতে হইবে। বিনম্র আচরণ এই কারণেও জরুরী যে, কোন মুসলমানের নিকট তাহার কোন অন্যায় বার বার উল্লেখ করা এবং এই বিষয়ে তাহাকে বিব্রত করা যেমন হারাম, তদ্রূপ তাহাকে কষ্ট দেওয়াও হারাম। কোন

আকলমন্দ ও বুদ্ধিমানের পক্ষ হইতে এমন আশা করা যায় না যে, তিনি রক্তকে রক্ত দ্বারা কিংবা পেশাব দ্বারা পরিষ্কার করিতে চাহিবেন। তদ্রূপ, কোন গর্হিত কর্ম দেখিয়া নীরবতা অবলম্বনের অপরাধ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর কঠোরতা আরোপ করাও যেন রক্তকে রক্ত দ্বারা ধৌত করারই নামান্তর। অথচ রক্তের নাপাকি রক্ত দ্বারা দূর হয় না। বরং পানি দ্বারাই উহাকে ধৌত করিতে হয়।

কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব বিষয়ে কোন অপরাধ করে এবং তুমি তাহা জানিতে পার, তবে এই বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, তুমি তাহাকে ভুল ধরাইয়া দেওয়ার ফলে সে হয়ত অপমানবোধ করিবে এবং এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সে হয়ত তোমার শত্রুতে পরিণত হইবে। অবশ্য তুমি যদি ইহা জানিতে পার যে, ভুল ধরাইয়া দিলে সে তোমার উপর বিরক্ত না হইয়া বরং খুশীই হইবে, তবে এই ক্ষেত্রে ভুল ধরাইয়া দেওয়া উত্তম। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হইল, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যাহারা নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিয়া সতর্ককারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

তৃতীয় স্তর ঃ ওয়াজ-নসীহত

ইহ্‌তিসাবের তৃতীয় স্তর হইল, ওয়াজ-নসীহত ও আল্লাহর আজাবের ভয় দেখাইয়া মানুষকে পাপাচার হইতে নিষেধ করা। এই স্তরটি সেইসব ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, যাহারা অন্যায়কে অন্যায় মনে করিয়া করে। যেমন কোন ব্যক্তি হয়ত মদপান, মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন ও মুসলমানের গীবত করায় অভ্যস্ত। অথচ এই ব্যক্তি ইহা ভালভাবেই জানে যে, শরীয়ত এই তিনটি বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদিগকে প্রথমতঃ ওয়াজ-নসীহত এবং আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করা এবং হাদীসে পাকের এমন সব বিবরণ শোনানো উচিৎ যাহাতে এইসব কাজের শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বুজুর্গানে দ্বীনের উন্নত চরিত্র ও তাহাদের ঘটনাবলী শোনানো হিতকর। ফলে উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যেও আমলের জযবা পয়দা হইবে।

ওয়াজ-নসীহতের এই আমলটি অতীব বিনয় ও নম্রতার সহিত করিতে হইবে। কেননা, কোনরূপ কঠোরতা এই ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হইতে পারে; অপরাধীকে হেকারত ও তুচ্ছ নজরে না দেখিয়া বরং মোহাব্বতের নজরে দেখিতে হইবে এবং তাহার অপরাধকে নিজেরই অপরাধ মনে করিতে হইবে। কেননা, সকল মুসলমানই এক দেহ ও এক প্রাণ।

এখানে একটি ভয়াবহ বিপদের বিষয় হইল, এক শ্রেণীর আলেম ও কতক

ওয়ায়েজ মানুষকে তাহাদের অজ্ঞতা ও অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করার সময় নিজের এলেমের মাহাত্ম্য এবং সেই ব্যক্তির অজ্ঞতা ও মূর্খতার কথা স্মরণে আনিয়া পুলক অনুভব করিয়া থাকে। অনেকে তো কেবল এই উদ্দেশ্যেই ওয়াজ-নসীহত করিয়া বেড়ায় যে, উহার ফলে সকলের নিকট তাহার এলেম ও বিদ্যা-বুদ্ধির কথা প্রকাশ পাইবে এবং সেই সঙ্গে মানুষের অজ্ঞতা ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। তো ওয়াজ-নসীহতের উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করিয়া নিজের বড়ত্ব ও এলেমের গরিমা প্রকাশ করা, তবে এই ওয়াজের মাধ্যমে যেই অনিষ্ট দূর করার চেষ্টা করা হইবে; এই ওয়াজ নিজেই তদাপেক্ষা গুরুতর অনিষ্টের কারণ হইবে। এই ধরনের ইহ্‌তিসাবের উদাহরণ যেন নিজেকে জ্বালাইয়া অপরকে আগুন হইতে রক্ষার চেষ্টা করার মত। ইহা চরম মূর্খতা, অন্তহীন গোমরাহী এবং শয়তানের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। আল্লাহ পাক যাহাকে হেদায়েতের নূর দান করিয়াছেন কেবল সেই ব্যক্তিই শয়তানের এইরূপ ফেরেব হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

অপরের উপর হুকুম চালাইয়া মানুষের আত্মা দুইটি কারণে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ এলেমের গৌরব, দ্বিতীয়তঃ অপরের উপর কর্তৃত্ব চালাইবার অহংকার। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ লোকদেখানো রিয়া ও সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা মানুষের অন্তরের এক গোপন বাসনা এবং উহার ফলে মানুষ গোপন শিরকে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তরের এই গোপন ব্যাধি উপলব্ধি করা বড় কঠিন। এখানে আমরা এই ব্যাধি নির্ণয়ের একটি মানদণ্ড উল্লেখ করিব। এই মানদণ্ডের আলোকেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি নিজের অবস্থা যাচাই করিয়া দেখিতে পারিবে যে, সে এই রোগে আক্রান্ত কি-না। অর্থাৎ সে গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে– সে কি এইরূপ কামনা করে যে, তাহার নিজের মাধ্যমেই অপরের সংশোধন হউক, না এইরূপ কামনা করে যে, এই নেক কাজে অপর কোন ব্যক্তি অগ্রসর হউক, কিংবা গর্হিত কর্মটি যেন নিজে নিজেই দূর হইয়া যায় এবং ইহ্‌তিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কোন প্রয়োজনই না হয়।

অর্থাৎ, ইহ্‌তিসাবের আমলটি যদি নিজের জন্য কষ্টকর ও বিব্রতকর মনে হয় এবং সে এইরূপ কামনা করে যে, অপর কাহারো মাধ্যমেই যেন অন্যায়ের প্রতিরোধের কাজটি সমাধা হয়, তবে তাহার উচিৎ ইহ্‌তিসাবের উপর আমল করা। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহার এই আমলটি হইবে সত্যিকার অর্থেই দ্বীনের স্বার্থে। পক্ষান্তরে তাহার অন্তরে যদি এই বাসনা সুপ্ত থাকে যে, অপরাধীকে তাহার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাহা দূর করার দায়িত্ব আমিই পালন করিব এবং আমার উদ্যোগেই এই অন্যায় দূর হইবে, তবে তাহার পক্ষে এই

উদ্যোগ তরক করা উত্তম। কেননা, এই ক্ষেত্রে সে নেহী আনিল মুনকারের আমলকে নিজের জন্য ইজ্জত ও সুখ্যাতির অর্জনের বাহন বানাইতে চাহিতেছে। তাহার উচিৎ আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজের নফসের এছলাহের ফিকির করা। এমন যেন না হয় যে, অপরকে সংশোধন করিতে গিয়া সে নিজেই বরবাদীর শিকার হইয়া পড়ে। পবিত্র কোরআনে প্রথমে নিজের নফসকে নসীহত করিতে বলা হইয়াছে এবং নিজের নফস নসীহত কবুল করিবার পরই অপরকে নসীহতের কথা উল্লেখ হইয়াছে।

এক ব্যক্তি হযরত দাউদ তাঈ'র খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, এক ব্যক্তি আমীর ও শাসকবর্গের নিকট গিয়া সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে, তাহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? জবাবে তিনি বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছে, সেই ব্যক্তিকে চাবুক লাগানো হয় কি-না? লোকটি বলিল, সেই ব্যক্তি এই সবের কোন পরওয়া করে না। হযরত দাউদ তাঈ বলিলেন, তবে আমার আশংকা হইতেছে, সেই ব্যক্তির গর্দানে হয়ত তলোয়ার রাখা হইবে। লোকটি আবারও আরজ করিল, সেই ব্যক্তি এইসবেও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। এই বার হযরত দাউদ তাঈ এরশাদ করিলেন, আমার ভয় হইতেছে, সেই ব্যক্তির অন্তরে গোপন ব্যাধি অর্থাৎ অহংকার ও তাকাব্বুরী পয়দা হয় কি-না।

চতুর্থ স্তরঃ তিরস্কার ও কঠোরতা

ইহ্‌তিসাবের চতুর্থ স্তর হইল, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া অন্যায় কাজ হইতে বারণ করা। অর্থাৎ নরম ভাষায় নসীহত করিবার পরও যদি লোকেরা অন্যায়ের উপর জমিয়া থাকে এবং ওয়াজ-নসীহতের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে, তবে এই ক্ষেত্রে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ওয়াজ-নসীহত ও নরম ভাষার সকল স্তর অতিক্রম করিবার পর নিজের কওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন–

أُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অর্থঃ "ধিক তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদেরই এবাদত কর, তাহাদের জন্য। তোমরা কি বোঝ না?" (সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৬৮)

কঠোর ভাষা ব্যবহারের অর্থ ইহা নহে যে, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। বরং অপরাধীর প্রতি এমন ভাষা প্রয়োগ করিবে যাহা অশ্লীলতার মধ্যে গণ্য নহে। যেমন হে নির্বোধ, হে পাপিষ্ঠ! তোমার কি আল্লাহর ভয় নাই– ইত্যাদি।

বস্তুতঃ যেই ব্যক্তির বিবেক নাই, সে নির্বোধ বটে। বিবেক থাকিলে নিশ্চয়ই

সে আল্লাহর নাফরমানী করিত না। বুদ্ধিমান ও নির্বোধ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله ·

অর্থঃ "সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যার নফস অনুগত এবং যে পারলৌকিক জীবনের জন্য আমল করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ যার নফস খাহেশাতের আনুগত্য করে এবং আল্লাহর নিকট মিথ্যা বাসনা করে।" (তিরমিজী, ইবনে মাজা)

উপরে বর্ণিত স্তরের উপর আমল করার দুইটি স্তর রহিয়াছে–

প্রথমতঃ যখন দেখিবে যে, নরম ভাষার ব্যবহার ও সাধারণ নসীহতে কোন কাজ হইতেছে না, তখন কঠোর ভাষা ব্যবহার করিবে।

দ্বিতীয়তঃ একটি বর্ণও মিথ্যা বলিবে না। এমন নহে যে, নিজের মুখকে বে-লাগাম ছাড়িয়া দিবে এবং মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া বকাঝকা করিতে থাকিবে। মোটকথা, যাহা বলিবে তাহা সত্য বলিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলিবে না।

কঠোর ভাষা ব্যবহারের পরও যদি এইরূপ মনে হয় যে, লোকটি সেই গর্হিত কর্ম ত্যাগ করিবে না, তবে এমতাবস্থায় নীরব থাকাই উত্তম। তবে নিজের আচার-আচরণ দ্বারা অবশ্যই অসন্তোষ প্রকাশ করিবে এবং অন্তর দ্বারাও তাহার পাপকে ঘৃণা করিবে। অর্থাৎ এই পাপের কারণেই সেই ব্যক্তিকে কেবল হীন মনে করিবে– উহার অতিরিক্ত কিছু নহে। তাছাড়া যদি এইরূপ একীন হয় যে, নসীহত করিলে আমাকে দৈহিকভাবে কষ্ট দেওয়া হইবে, আর অসন্তোষ প্রকাশ করিলে দৈহিক নির্যাতন হইতে নিরাপদ থাকা যাইবে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নসীহত করা জরুরী নহে বটে কিন্তু অন্তর দ্বারা খারাপ জানা এবং নিজের আমল দ্বারা তাহা প্রকাশ করা জরুরী হইবে।

পঞ্চম স্তরঃ হাত দ্বারা বাধা দেওয়া

যদি সম্ভব হয় তবে অসৎ কাজে হাত দ্বারা বাধা দিবে। যেমন– গানবাজনার সরঞ্জাম ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, শরাব ফেলিয়া দিবে, রেশমের পোশাক খুলিয়া ফেলিবে, রেশমের বিছানায় বসিতে দিবে না, নাপাক অবস্থায় মসজিদে ঢুকিতে দিবে না এবং ঢুকিয়া থাকিলে বাহির করিয়া দিবে– ইত্যাদি। তবে এমন কিছু কাজ আছে যাহা হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়া যায় না। যেমন মুখ ও অন্তরের পাপ। অর্থাৎ, ইহা হাত দ্বারা দূর করিবার কোন উপায় নাই।

এই স্তরের উপর আমল করিবারও দুইটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ হাত দ্বারা

বাধা দেওয়ার কাজটি তখন করিবে, যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সেই অন্যায় কর্ম ত্যাগ না করিবে। যদি ওয়াজ-নসীহত ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ দ্বারা কার্যোদ্ধার হয়, তবে হাত ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নাই। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি হয়ত জবর দখলকৃত বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে বা নাপাক অবস্থায় মসজিদে বসিয়া আছে। এমতাবস্থায় কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিলে যদি সেই ব্যক্তি বাড়ীর দখল ছাড়িয়া দেয় বা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসে, তবে ধাক্কা দেওয়া বা টানাহেঁচড়া করা জায়েজ নহে। শরাব ফেলিয়া দেওয়া, বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা বা রেশমের পোশাক খুলিয়া ফেলার ক্ষেত্রেও এই একই নীতি অনুসরণ করিবে।

দ্বিতীয় আদব হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই করিবে– উহার অতিরিক্ত নহে। যেমন জবর দখলকৃত বাড়ীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি বা নাপাক অবস্থায় মসজিদে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে যদি হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহাকে টানা হেঁচড়া করা, ধাক্কা দেওয়া, দাড়ী ধরিয়া টানা বা চেঙদোলা করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করা– ইত্যাদি জায়েজ নহে। কেননা, এখানে হাত ধরিয়া বাহির করার মধ্যেও উদ্দেশ্য পূরণ হইতেছে। সুতরাং অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। অনুরূপভাবে রেশমের পোশাক একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না, বরং এমনভাবে উহার সেলাই খুলিয়া ফেলিবে যেন উহা ব্যবহারের উপযোগী না থাকে। অবৈধ খেলতামাশার উপকরণ ও বাদ্যযন্ত্র আগুনে না ফেলিয়া বরং এই পরিমাণ নষ্ট করিয়া দিবে যেন যেই কাজের জন্য উহা তৈরী করা হইয়াছে সেই কাজে ব্যবহার করা না যায়।

কোন দ্রব্য নষ্ট করার সীমা

কোন অবৈধ দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলারও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ উহাকে এই পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিবে যেন পুনরায় উহা মেরামত করিতে হইলে প্রথমবার উহা বানাইতে যেই পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় হইয়াছে, মেরামতের ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে হইবে। শরাবের পাত্র না ভাঙ্গিয়া যদি উহা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা ভাঙ্গিবে না। অবশ্য পাত্র না ভাঙ্গিয়া উহা ফেলিয়া দেওয়ার যদি কোন সুযোগ না থাকে, তবে নিরুপায় হইয়া উহা ভাঙ্গিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বাঁধা দানকারীর উপর ঐ পাত্রের ক্ষতিপূরণও আবশ্যক হইবে না। অর্থাৎ শরাবের কারণেই উহার মূল্য বাতিল হইয়া যাইবে। কেননা, শরাব ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পাত্র প্রতিবন্ধক ছিল এবং উহা ভাঙ্গা ব্যতীত শরাব ফেলিয়া দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। এমনকি শরাব ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি অপরাধীর দেহ প্রতিবন্ধক হয়, তবে তাহার দেহও যখম করা যাইবে।